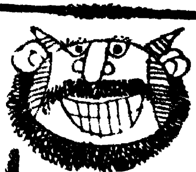
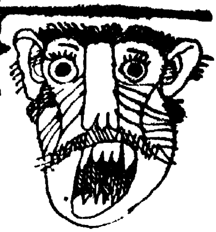
মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত সম্পাদিত

সাত ভূতের গল্প





বুক ট্রাস্ট
৩০/১ বি, কলেজ রো
কলকাতা ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ / মার্চ ১৯৫৯

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ / সুনীল শীল

প্রকাশক বরুণ গঙ্গোপাধ্যায় বুক ট্রাস্ট ৩০/১ বি কলেজ রো কলকাতা ৭০০০০৯ মুদ্রক যশোদা মাইতি ৫২/১ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট কলকাতা ৭০০০০৯

সমস্ত দেশের সাহিত্যেই ভৌতিক গল্পের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বাংলা সাহিত্যেও ভৌতিক গল্পের বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য উল্লেখ করবার মতো। ভূত আছে কি নেই এবং ভূতের বৈচিত্র্য-বৈশিষ্ট্য কি ও কেমন তাত্ত্বিকেরা তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন। তবে সাহিত্যে ভূতের বৈচিত্র্য এবং প্রাচুর্যকে আড়াল করার উপায় নেই।

সাহিত্যে ভূতের ভূমিকা দুরন্ত। পৃথিবীর সব দেশের সাহিত্যেই ভূতের বিচরণ ও প্রভাব উল্লেখ্য। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে পর্যন্ত ভূতের মৃদু পদসঞ্চার দেখতে পাওয়া যায়। সহজাত সংস্কার থেকে মানুষের মনে ভয়ের যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, সেই ভীতিভাবনাই পরবর্তী সময়ে মানুষকে ভূত সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলেছে। মানুষের এই চিরকালীন আগ্রহই যুগে যুগে ভৌতিক গল্পের জন্ম দিয়েছে। একই কারণে বাংলা সাহিত্যেও ভূতের সংসার নেহাত ছোট নয়। প্রথাসিদ্ধ ভূত থেকে হাল আমলের চৈনিক খাদ্যরসিক ভূতেরও সন্ধান বাংলা সাহিত্যে বিরল নয়। বাংলা সাহিত্যে ভূত বেশ বীরদর্পেই ঘোরাঘুরি করেছে, এখনও করছে। তবে সময়ের পালাবদলে গল্পকারদের মানসিকতারও পরিবর্তন ঘটায়, সাম্প্রতিক-কালে ভূতভাবনারও পালাবদল ঘটেছে। এখনকার ভূত অনেক অনেক বেশি নাগরিক। পরিত্যক্ত পরিবেশ, হানাবাড়ি, শ্মশানবাস ইত্যাদিতে তার কেমন অরুচি; বীভৎস ভাবে ভয় দেখাতেও কেমন যেন সঙ্কোচ, কিছুটা আড়াল করে অস্তিত্ব জাহির করতেই যেন ভালোবাসে। যাহোক, তবু তো ভূত। এবং ভূত বলেই তো ভূতের গল্প!

মানুষের মনের ভূত যেহেতু মিথ্যে নয়, গল্পের ভূতও সেহেতু অনেক বেশি সত্য। অন্তমনে ভূত ভীতির কারণ হলেও পাঠকের ভীতিজনিত কৌতূহলী মনই কিন্তু তাকে আরো বেশি করে ভূতের গল্পের দিকে ঠেলে দেয়। সাহিত্যের ভূত সেজন্য আরও সত্যি। এবং বলা যেতে পারে, সাহিত্যের এই ভূতমনস্কতাই বর্তমান সংকলনের উৎস।

'সত্যি ভূতের গল্প' এ সময়কার কয়েকজন বিশিষ্ট গল্পকারের বহু বিচিত্র ভূতভাবনার সংকলন। ভূত এ ক্ষেত্রেও অবশ্যই সত্যি ভূত; সাহিত্যে যে ভূত লেখকের কল্পনায় আরও বেশি সজীব। বর্তমান সংকলনের সত্যি ভূতের কৃতিত্ব, সে সময়ের সঙ্গে নিজেকে আশ্চর্য ভাবে মানিয়ে নিলেও কোথাও আর ভূত চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে কিন্তু মিথ্যে হতে দেয় নি।

'সত্যি ভূতের গল্প' নেহাতই একগুচ্ছ নানা স্বাদের ভৌতিক গল্পের সংকলন। গল্পকারদের ভূতভাবনার বৈচিত্র্যের পরিপ্রেক্ষিতেই গল্পগুলি সাজানোর প্রয়াস উৎসাহী পাঠক অবশ্যই লক্ষ্য করবেন বলে বিশ্বাস। পরিশেষে, বর্তমান সংকলনের গল্পকারদের সহযোগিতাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। শ্রীযুক্ত সত্যজিৎ রায়ের গল্পের সম্মতি তরুণ কবি সুব্রত রুদ্রের সৌজন্যে ও আগ্রহে প্রাপ্ত। বর্তমান সংকলন দ্রুত প্রকাশের ব্যাপারে তরুণ প্রকাশক বরুণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আগ্রহ এবং সম্পাদনা-সহায়তায় নন্দিতা দাশগুপ্তের সহযোগিতা উল্লেখ্য।

অজয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

প্রেমেন্দ্র মিত্র / ৯
সত্যজিৎ রায় / ১৯
বিমল কর / ৩৮
মনোজ বসু / ৪৭
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ / ৫৬
আনন্দ বাগচী / ৬৪
বিমল মিত্র / ৮১
হিমানীশ গোস্বামী / ৯০
কণা বসুমিশ্র / ১০৩
পার্থ চট্টোপাধ্যায় / ১১২
অজেয় রায় / ১২২
দিব্যেন্দু পালিত / ১৩২
বিজনকুমার ঘোষ / ১৩৭
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় / ১৪৭
শেখর বসু / ১৬২
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় / ১৬৮
মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত / ১৮১

'তেনা-রা'

প্রেমেন্দ্র মিত্র

"ফ্যাঁ...শ।

না, আওয়াজটা ঠিক বোঝানো গেল না। শুধু লেখা অক্ষরের মারফত বোঝানো যায়ও না বোধহয়। ও আওয়াজ ধরবার মত বর্ণ-পরিচয় কোনো ভাষাতেই তৈরি হয়নি। শুধু উদাহরণ দিয়ে একটু বোঝাবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

কী উদাহরণ দেব? এই যেমন একজোড়া কোরা কাপড় মাঝখান থেকে ধরে দু'হাতে ছিঁড়ে দু'ফাঁক করা।

না, শুধু তা-ই নয়, সে-কাপড় ছিঁড়ে দু'ফাঁক করার শব্দের সঙ্গে একটা ডুকরে-উঠতে-চাওয়া কান্নাকে যেন প্যাঁচানো ছিপি ঘুরিয়ে চেপে দেওয়া।

আওয়াজ যেমনই হোক, ভড়কালাম না। ভড়কাব কেন? খুঁজে-পেতে সাধ করে এমন একটা ডাকসাঁইটে কম-সে-কম দু'শো বছরের পোড়োবাড়িতে রাত কাটাতে এসেছি, এমন দু'চারটে বুকের-রক্ত-জল-করা আওয়াজ শুনতে হবে না! এ আওয়াজ তো শুধু উপক্রমণিকা মাত্র। তারপর যা হতে পারে, তার জন্যেই তৈরি থাকা দরকার।

টর্চটা তাই একবার জ্বেলে পরীক্ষা করে নিলাম। হ্যাঁ, ব্যাটারি একেবারে নতুন। কালিমাড়া অন্ধকারে যেন সার্চলাইটের মত

জোরালো রোশনাইয়ের তেজ নিয়ে ভাঙা দালানের উত্তরের হাঁ-করা জানলাটা বুনো লতা-পাতার ফাঁসে জড়ানো সবে-ধন-নীলমণি দোমড়ানো শিকটা সমেত স্পষ্ট করে তুলল।

টর্চটা নেভাবার আগে কাছের বাতিদানে মোমবাতিটা জ্বেলে নিলাম। ধূপও জ্বালিয়ে দিলাম ক'টা। বহুকাল ইঁদুর-চামচিকের-বাসা-হওয়া দালানের এঁদো ভ্যাপসা গন্ধটা একটু হাল্কা করবার জন্যে। তারপর গুপ্তি লাঠিটারও ওপরের খাপ খুলে ভেতরের সড়কিটা ভালো করে দেখে নিয়ে খোলা অবস্থাতেই পাশে নিয়ে এই পাতাটা লিখতে বসলাম।

হাতঘড়িটায় দেখে নিলাম, রাত একটা বাজতে তিন মিনিট।

তিন মিনিটে না হোক, আর তিন ঘণ্টার মধ্যে যা হবার হবেই। আওয়াজের যে নমুনা দিয়ে পালাটা শুরু হয়েছে, তাতে রাত জাগার মজুরি ভাল করেই পোষাবে বলে মনে হয়।

এ পর্যন্ত লিখে কলমটা থামিয়ে চারিদিকে একবার তাকালাম। আবহাওয়াটা অনুকূল বলেই মনে হচ্ছে। বাইরে হাওয়া-টাওয়া নেই। মোমবাতির সলতেটা প্রায় নিষ্কম্প হয়ে জ্বলছে। নেহাত শীর্ণ একটা বাতি, তার আলো আমার বসবার জায়গা আর খাতাটা ছাড়িয়ে অতি ভয়ে-ভয়েই যেন আবছা অন্ধকার দেয়াল আর ছাদের দিকে এগোতে গিয়ে থেমে আছে।

ঝিঁঝিঁ-টিঝি নয়, কী-একটা অজানা পোকা অন্ধকার নিস্তব্ধতাটাই যেন থেকে-থেকে আচমকা কুরে কুরে ফুটো করবার চেষ্টা করছে।

কোরা কাপড় ছিঁড়ে দু'ভাগ করার সঙ্গে প্যাঁচানো ছিপিতে চেপে দেওয়া কান্না মেশানো যে আওয়াজটা খানিক আগে শুনেছিলাম, সেটা একেবারে থেমে গেলেও কিছু-একটা হবার সময় ঘনিয়ে আসছে বলেই মনে হয়।

লেখবার খাতাটা সরিয়ে রেখে তৈরি হয়ে বসলাম।

কোন্ দিক দিয়ে কী ধরনের চমকটা আসবে, তা ভাবার চেষ্টা

করে লাভ নেই। তবে এই ভাঙা দালানের মধ্যেই কিছু একটা হওয়ার কথা। আমার পেছনে নয় সামনে।

পেছনে কিছু হওয়ার সম্ভাবনাটা একেবারে দেয়ালেই পিঠ দিয়ে বসে এক রকম কাটিয়ে রেখেছি বলা যায়। ঝুল ধুলো সব সাফ করে তার জন্যে একটু খাটতেও হয়েছে। আগেকার দিনের তৈরি দেওয়ালটা বেশ মজবুতই আছে এখনো। পুরনো পঙ্কের কাজ বেরঙা হয়ে উঠে গেলেও কোথাও ফাটল-টাটল ধরেনি।

তাই পেছনে কিছু হতে গেলে দেওয়ালটা ভেঙে বা উড়িয়ে দিয়েই হবে। সে সুদূর সম্ভাবনাটা আপাতত বাতিল করে সামনের দিক সম্বন্ধেই সজাগ হলাম।

হয়ত ছ'পাশের পলস্তারা-খসে-হাড়পাজরা-বেরোনো দেওয়ালের ধারে জমে-থাকা ভাঙা ঘুণ-ধরা সব আসবাবপত্রের স্তূপ, কিংবা সামনের ওই হাঁ-করা বিভীষিকার মত জানলাটাতেই তাঁদের কারুর আবির্ভাব দেখব। মাথার ওপরকার প্রায় অন্ধকার ছাদটা থেকেও কিছু হতে পারে।

কিন্তু কই?

হাত-ঘড়িটায় মাঝে-মাঝে আপনা থেকেই চোখ না দিয়ে পারছি না। পাঁচ দশ মিনিট করতে করতে বড় কাঁটাটা যে নিচের ছয়ের দাগ ছুঁই ছুঁই করছে! অথচ সেই গায়ে-কাঁটা-দেওয়া প্রথম আওয়াজের পর আর কোনো সাড়াশব্দই নেই। আজ ধাপধাড়া এক আধা জংলী মুল্লুকের অন্তত দশ-কুড়ি বছর পার-করা এক পোড়ো ভিটের ভাঙা দালানের বদলে চৌরঙ্গীর কোনো দোকানের দোতলায় বসে আছি ভাবলেও চলে।

দেড়টার দাগ পার হয়ে ঘড়ির বড় ছোট কাঁটা ক্রমশ ছ'টোর পৌঁছে গেল। নিশুতি রাত ভেতরে-বাইরে ঝিমঝিম করছে।

কিন্তু ওই পর্যন্তই। তার বেশি আর কোনো অভাবিত কিছুর একটু উঁকি পর্যন্ত নেই।

শেষকালে এত তোড়জোড় করে আসার হয়রানি, রাত জাগার এই ধকল সব মিথ্যে হবে নাকি ?

এইটুকু লিখে বেশ একটু হতাশা নিয়েই খাতাটা আবার বন্ধ করলাম ।”

খাতাটা বন্ধ করলাম আমিও, এবং একটু নয়, রীতিমত হতাশ হয়ে।

এত আশা এত আগ্রহ নিয়ে শুরু করার পর শেষ অবধি এমনি করে আহাম্মকের মার খাওয়া ?

সমস্ত ব্যাপারটা এখন গোড়া থেকে একটু খুলে বলতে হয়। এতক্ষণ ধরে অধীর কৌতূহলে যা পড়ছিলাম তা একটি পুরনো ছেঁড়াখোঁড়া অনেক-ঘাঁটা-ঘাঁটিতে-ময়লা বেরঙা মোটা খেরো খাতা মাত্র। খাতার বদলে কাগজের বাণ্ডিল বললেও হয়। আলগা পাতাটাতা খসে হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে একটা লাল শালুর পুঁটলির মধ্যে বাঁধা।

সেই অবস্থাতেই আমি পেয়েছিলাম শহরের বোধহয় সবচেয়ে লম্বা দৌড়ের পঁয়তাল্লিশ নম্বর বাসে।

যাচ্ছিলাম বালিগঞ্জ হয়ে এয়ারপোর্টে। ভি-আই-পি রোড ধরে বাঙ্গুর কলোনি টলোনি ছাড়াবার পর আমার দিকের সীট-গুলো কিছুটা খালি হয়ে গিয়েছিল। সেই সময়েই বাণ্ডিলটা ঠিক আমার পাশেই দেখলাম। এ বাণ্ডিল যে কার, তার কোনো হদিশ মেলেনি। স্পষ্টই কাগজ ভরা আলগা বাণ্ডিল দেখে উপস্থিত সকলের সামনে খোলার পরও মালিকানাটা অজানাই থেকে গেছে।

দলিলপত্র বা দামী কাগজ-টাগজ নয়, নেহাত জড়ানো সেকেলে হাতের লেখায় ভরা একটা হাতে-সেলাই সস্তা কাগজের খেরো খাতা দেখে সেটা আমার হাতে দিতে কারুর আপত্তি হয়নি। খাতাটা আগাগোড়া হাতড়ে নাম-ঠিকানা কিছু পেলে আমিই মালিককে পাঠিয়ে দেব বলে কথা দিয়েছি।

খাতাটা মালিকের কাছে পৌঁছে দেবার এই বেফায়দা ঝামেলা সাধ করে ঘাড়ে নেওয়াটা নেহাত পরোপকারের মহত্ত্ব নয়। বাসে সকলের সামনে বাণ্ডিল খুলে খাতাটা উল্টোবার সময় একটা এমন কথা চোখে পড়েছিল, যাতে সেটা একটু নেড়ে-চেড়ে দেখবার লোভ সামলাতে পারিনি।

বাড়িতে এনে আগাগোড়া নেড়ে-চেড়ে দেখেও সেই কথাটুকুর বেশি লেখক বা মালিকের নাম ঠিকানা কিছুই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। খাতার মধ্যে ছোট চিরকুট গোছের একটা চিঠির খসড়া পেয়ে তা থেকে কিছু হদিশ পাবার যে আশাটুকু হয়েছিল, চিঠি পড়বার পর তাও বরবাদ হয়ে গিয়েছে। চিঠির চিরকুটটি খাতার লেখক ও মালিকেরই যে লেখা, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু কাকে লেখা হচ্ছে বা কে লিখছে, তার কোনো পরিচয় সেখানে মেলেনি। চিঠিটি এইরকম—কল্যাণবরেষু, সরকার ভায়া, তুমি যে আস্তানার খবর দিয়েছ সেটা লোভনীয় বলেই মনে হচ্ছে। যোগাড়-যন্তর সব করে রাখো। আসছে অমাবস্যার দিনই গিয়ে পৌঁছোচ্ছি। আপাতত আগের বৃত্তান্তগুলো লিখে ফেলতে ব্যস্ত। ওসব জমিজমার হিসেবপত্র বড়কর্তাকে বুঝিও। অমাবস্যার জন্যে তৈরি থেকো। আশীর্বাদ নিও। ইতি মেজকর্তা।

চিঠিটা কোনো কারণে ফেলা হয়নি বলে এই মেজকর্তা নামটুকুই শুধু পেয়েছি। এই মেজকর্তা নামটুকু বাদে আর যে কথাটি প্রথমেই পেয়েছিলাম সেইটেই হল মোক্ষম।

কথাটা হল ভূত-শিকার! হ্যাঁ, মেজকর্তা যে-ই হন, তিনি এক সৃষ্টিছাড়া মানুষ। ভূত শিকারই তাঁর নেশা। আঁদাড় পাঁদাড় বন-বাদাড় যত বেয়াড়া বিদঘুটে জায়গাই হোক, হদিস কিছু পেলেই তিনি ভূত শিকার করে বেড়ান। এই খাতা তাঁর সেই সব শিকারের বৃত্তান্ত।

খাতার গোড়ার পাতার ভূমিকায় এই পরিচয়টুকু পেয়ে সত্যিকার

রুদ্ধ নিশ্বাসে মেজকর্তার পুঁথি পড়তে শুরু করেছিলাম।

কিন্তু এ কী ধরনের ঘাটের কাছে এসে ভরাডুবি।

তবু শুরু যখন করেছি, তখন যেমন করে হোক শেষ করার জন্যে পাতা উল্টে বাকিটা পড়বার চেষ্টা করলাম।

পড়বার আকর্ষণ কিছু নেই। মেজকর্তা নিজেই তাঁর আশাভঙ্গ নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করছেন ঃ

"কিন্তু খাতা বন্ধ করে রেখেই বা লাভটা কী? ঘড়ির কাঁটা ঘুরেই চলেছে। রাত এখন প্রায় তিনটে। কিছুই যে হচ্ছে না, সেটাও লিখে যাওয়া দরকার। এমন ভাবে যে রাতটা শেষ হবে, তা ভাবতেও পারা যায়নি। যা হল, তা যেন বড় বেশি আশা করার মুখে ভাগ্যের থাপ্পড়।

এমনটা যে হতে পারে, তার একটু আভাস একেবারে পাইনি এমন কিন্তু নয়। অবশ্য অখাদ্য স্টেশনটায় নেমে সাইকেল-রিকশা ভাড়া করার সময় কাছাকাছি অনেকে যে অবাক হয়েছিল, তা দেখে অখুশি হইনি। তাদের একটু সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসাতেও না।

'কোথায় যাবেন বাবু? নৈহারের পাঁচকুঠি?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু নৈহার যে শুধু জঙ্গল বাবু, আর পাঁচকুঠির একটাই শুধু ঘাড়মুখ গুঁজে পড়বার জন্যে কোনরকমে খাড়া থেকে ধুঁকছে।'

তবু রিকশা একটা পেয়েছিলাম শেষ পর্যন্ত। রিকশাওয়ালার গরজ বা সাহস অন্যদের চেয়ে একটু বেশি। সেও কিন্তু নৈহারের পাঁচকুঠিতে পৌঁছে দিয়েই চলে যাবার কড়ারে সওয়ারী করেছিল। বেশি ভাড়ার লোভ দেখিয়েও তাকে সকালটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি করানো যায়নি।

রাস্তায় পাঁচকুঠি নিয়ে তার সঙ্গে একটু আলাপ করবার চেষ্টাতেও বিফল হয়েছি। নৈহারের এই জংলা অঞ্চলটা ভালো জায়গা নয়, আর পাঁচকুঠিতে তার বাপ-দাদারাও কখনো মানুষের

বাস দেখেনি, এর বেশি সে কিছু জানে না বা বলতে রাজি হয়নি। কেন এই ঘোর অন্ধকার রাতে পাঁচকুঠিতে আমি যাচ্ছি, সে জানতে চায়নি একবারও।

পাঁচকুঠির পোড়ো ভিটের কাছ-বরাবর আমার লাঠি আর কাঁধের ঝোলাটা নিয়ে রিকশা থেকে নামবার সময় অন্য সেই রিকশাওয়ালাকে দেখেছিলাম। আমাদের জন্যেই যেন সে অপেক্ষা করছিল ওখানে। আমাকে অমন জায়গায় একা নামতে দেখে অবাক যদি সে হয়ে থাকে, তার কথায় তা কিন্তু বোঝা যায়নি। কেন যে ওখানে নামছি, নিজে থেকেই যেন বুঝে নিয়ে সে একটু সহানুভূতির স্বরে শুধু বলেছিল, 'পাঁচকুঠিতে রাত জাগবেন তো! তা জাগুন গিয়ে। কিন্তু তেনাদের কাউকে পাবেন না।'

'তেনাদের ?' আমি একটু বিরক্তি আর না-বোঝার ভান করে বলেছিলাম, 'তেনারা ? কী বলছ তুমি ? কাদের কথা বলছ ?'

'ওই যাদের সবাই ডরায়, আবার খোঁজেও'—অন্ধকারেই লোকটার মুচকি হাসি যেন তার গলার স্বরে ফুটেছিল, 'সোজা করেই তাহলে বলি। বলছি আমাদের ভূত-পেত্নীদের কথা। তাঁরা এখানে নেই।'

মেজাজটা এবার সত্যিই একটু গরম হয়েছিল। বিদ্রূপ করে বলেছিলাম, 'তাঁরা নেই তো হয়েছে কী ? আমি যে তাঁদের খোঁজে এসেছি, তোমাকে কানে-কানে বলেছি সে-কথা ?'

'আজ্ঞে না, তা বলবেন কেন ?' লোকটা লজ্জা পেয়েই অন্ধকারে যেন জিভ কেটেছিল, 'বেয়াদবি আমার মাফ করবেন।'

এইটুকু বলেই লোকটা হঠাৎ যেন কান খাড়া করে একটু টান হয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'শুনতে পাচ্ছেন তো ?'

ভাড়া নিয়ে আমার রিকশাওয়ালা তখন ফিরে যাচ্ছে। সেদিকে চেয়ে রুক্ষ গলাতেই বলেছিলাম, 'কী, শুনব কী ? ও তো আমর রিকশাওয়ালার ঘন্টি

'আজ্ঞে না।' লোকটা এবার জোর দিয়ে বলেছিল, 'সাইকেলের ঘন্টি নয়, সরাইল্লার ডাক। সরাইল্লা আজ যখন আছে, তখন ভাবনা নেই।'

কী, বকছে কী লোকটা? পাগল-টাগলই তো মনে হয়।

একটু ধমকের সুরেই বলেছিলাম, 'কী সব বাজে বকছ? সরইল্লা আবার কী?'

'আজ্ঞে সরাইল কুকুর! ওই শুনুন না? 'লোকটা পোড়া পাঁচ-কুঠির ভিটের দিকেই আঙুল দেখিয়েছিল।

সে-দিকে ফিরে বেশ একটু মন দিয়েই শোনবার চেষ্টা করেছিলাম তারপর। কিছুই কিন্তু শুনতে পাইনি। সে-দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে লোকটাকে খুব কড়া বকুনিই দিতাম। কিন্তু দেখি, বকুনিটা অনুমান করেই সে ইতিমধ্যে কখন নিঃশব্দে তার রিকশা নিয়ে সরে পড়েছে।

তার পর থেকে এই নিষ্ফল পাহারাই চলেছে। রাত তিনটে বিশ।

হঠাৎ, ও কী!

না, না, ওই তো! এবার ঠিক শুনতে পেয়েছি। লোকটা তাহলে মিথ্যে বলেনি। কুকুরের ডাক। যে-সে কুকুর নয়, সেই বিখ্যাত সরাইল কুকুরের জাত। কিন্তু ডাকটা আরও যেন হিংস্র আরও বুক-কাঁপানো।

সেই সেকালের পুব বাংলার সরাইল কুকুর এখানে কোথা থেকে আসবে, সে-কথা ভাববার মত মনের অবস্থা নয়। সমস্ত শরীরটা শুধু যেন হিম হয়ে যাচ্ছে। অথচ লোকটা বলেছিল, সরাইল কুকুর যখন আছে তখন ভাবনা নেই। কেন বলেছিল সে-কথা? বোঝবার চেষ্টা করবার আগেই শিউরে উঠল শরীরটা। হচ্ছে! কিছু-একটা হচ্ছে!

একটা শব্দ, না একটা গন্ধ, না শুধু একটা অনুভূতি, তা

বুঝতে পারছি না। কিন্তু মোমবাতির আবছা আলোটাই যেন একটা আতঙ্কের কাঁপুনি ছড়াচ্ছে।

গুপ্তি লাঠিটা কাছে টেনে টর্চের বোতামটা টিপলাম। কিন্তু আলো কই? টর্চ থেকে খানিকটা অন্ধকারের তোড়ই যেন সামনে গিয়ে হাঁ-করা জানলাটার ওপর পড়েছে। আর সেখানে? সেখানে সেই মাথা আর চোখ!

না, পুরুষ কি মেয়ে কি কঙ্কালের মুখ কি চোখ নয়! অজগর! অতি বড় দুঃস্বপ্নের কল্পনা ছড়ানো বীভৎস বিরাট ভয়ঙ্কর এক অজগরের মাথা ধীরে ধীরে জানলার দোমড়ানো গরাদে আরও সরিয়ে পিছলে গলে আসছে, কালো বিদ্যুতের মত কাটা জিভটা পলকে পলকে বার করতে করতে। মুখ আর জিভের চেখে ভয়ঙ্কর তার চোখ। তাতে পলক পড়ে না, শুধু যেন সম্মোহনের সাঁড়াশিতে জাঁতাকলের চেয়ে সবলে চেপে ধরে অসাড় করে রাখে।

সেই মুহূর্তে সরাইলটাকে দেখলাম। কুকুর নয়, যেন কালো চিতারই একটা চাবুক-তীক্ষ্ণ খুদে নমুনা!

অজগরটা জানলা দিয়ে গলে তখন নিয়তির মত এগিয়ে আসছে। সরাইলটা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার মাথাটা লক্ষ্য করে।

সম্মোহনটা কি কেটে গেল তাইতেই? সড়কি-লাঠিটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম এক লাফে। পাগলের মত সেই সড়কির খোঁচার পর খোঁচা বসালাম অজগরটার গায়ে মাথায় চোখে। বিরাট কাছির মত দেহটা তার কিলবিলিয়ে উঠল সেই দারুণ খোঁচায়।

কিন্তু, কিন্তু, সেই কিলবিলিয়ে ওঠার মধ্যেই সে সরাইলটাকে তার কুণ্ডলীর মধ্যে পাক দিয়ে ফেলেছে যে।

অক্লান্ত ভাবে সড়কি চালিয়ে চললাম। অজগরের মরণ-খিঁচুনি থেমে গেল শেষ পর্যন্ত। কিন্তু সেই সঙ্গে তার আলিঙ্গনে পিষে গুঁড়ো হওয়া সরাইলটারও।

নিজেকেও প্রায় বেহুঁশ হয়েই মেঝের ওপর শুয়ে পড়তে হল

এবার। শুয়ে পড়বার আগে টর্চটা কোন-রকমে একবার অজগর আর সরাইলটার ওপর ফেললাম। না, তুটোই একেবারে শেষ হয়ে গেছে। মেঝেটা রক্তে আর অজগরের মুখের ফেনায় মাখামাখি।

বেশীক্ষণ নয়। মিনিট পাঁচেকের বেশি বেহুঁশ হয়ে থাকিনি। উঠে যখন বসলাম, তখন ঘড়িতে তিনটে পঁয়তাল্লিশ মাত্র।

মোমবাতিটা এরই মধ্যে কখন নিভে গেছে। টর্চের আলোতেই ঘড়িটা দেখে সেটা ঘরের মাঝখানে ফেললাম।

একটা অস্ফুট চিৎকার আপনা থেকে গলা ঠেলে বেরিয়ে এল তৎক্ষণাৎ।

হ্যাঁ, যা ভাবতেও পারিনি, সামনে তার প্রমাণ।

মেঝের ওপর রক্তমাখা ক্ষতবিক্ষত অজগর কি তার আলিঙ্গনে পিষে গুঁড়ো হয়ে যাওয়া সরাইল কুকুরটার চিহ্ন মাত্র নেই। মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে তারা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

তার মানে 'তেনা'রা বলতে যা বুঝি, সে-ধারণাটা আরও ছড়াতে হবে। নইলে পাঁচকুঠির কোন্ আদ্যিকালের ওরা এমন করে হঠাৎ আমায় দেখা দিয়ে যাবে কেন ?

এ-কাহিনীটি চোখে পড়লে মেজকর্তা উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে তাঁর খেরোখাতাটা দাবি করতে পারেন। লেখাটি সেই উদ্দেশ্যেই ছাপানো।

আর আমি তো গেঞ্জি পড়ে শুয়েছিলাম—তাহলে আমার গায়ে লম্বাহাতা সিল্কের সার্ট কেন ?

নীল আতঙ্ক

সত্যজিৎ রায়

আমার নাম অনিরুদ্ধ বোস। আনার বয়স উনত্রিশ। এখনো বিয়ে করিনি। আজ আট বছর হল আমি কলকাতার একটা সদাগরী আপিসে চাকরি করছি। মাইনে যা পাই তাতে একা মানুষের দিব্যি চলে যায়। সর্দার শঙ্কর রোডে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে আছি, দোতলায় দুখানা ঘর, দক্ষিণ খোলা। দু'বছর হল একটা অ্যাম্বাসাডর গাড়ি কিনেছি—সেটা আমি নিজেই চালাই। আপিসের কাজের বাইরে একটু-আধটু সাহিত্য করার সখ আছে। আমার তিনখানা গল্প বাংলা মাসিক পত্রিকায় বেরিয়েছে, চেনা মহলে প্রশংসাও পেয়েছে। তবে এটা আমি জানি যে, কেবলমাত্র লিখে রোজগার করার মত ক্ষমতা আমার নেই। গত কয়েক মাসে লেখা একদম হয়নি, তবে বই পড়েছি অনেক। আর তার সবই বাংলাদেশে নীলের চাষ সম্পর্কে। এ বিষয় এখন, আমাকে একজন অথরিটি বলা চলে। কবে সাহেবরা এসে আমাদের দেশে প্রথম নীলের চাষ শুরু করল, আমাদের গ্রামের লোকদের উপর তারা কিরকম অত্যাচার করত, কীভাবে 'নীল বিদ্রোহ' হল, আর সব শেষে কীভাবে জার্মানি কৃত্রিম উপায়ে নীল তৈরী করার ফলে এদেশ থেকে নীলের পাট উঠে গেল—এসবই এখন আমার নখদর্পণে। যে সাংঘাতিক অভিজ্ঞতার ফলে আমার মনে নীল

সম্পর্কে এই কৌতূহল জাগল, সেটা বলার জন্যই আজ লিখতে বসেছি।

এখানে আগে আমার ছেলেবেলার কথা একটু বলা দরকার।

আমার বাবা মুঙ্গেরে নামকরা ডাক্তার ছিলেন। ওখানেই আমার জন্ম আর ওখানের এক মিশনারি স্কুলে আমার ছেলেবেলার পড়াশুনা। আমার এক দাদা আছেন, আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়। তিনি বিলেতে গিয়ে ডাক্তারি পাশ করে লণ্ডনের কাছেই গোল্ডার্স গ্রীন বলে একটা জায়গায় হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করছেন; দেশে ফেরার বিশেষ ইচ্ছে আছে বলে মনে হয় না। আমার যখন ষোল বছর বয়স তখন বাবা মারা যান। তার কয়েকমাস পরেই আমি মা-কে নিয়ে কলকাতায় এসে আমার বড় মামার বাড়িতে উঠি। মামাবাড়িতে থেকেই আমি সেণ্ট জেভিয়ার্স থেকে বি. এ. পাশ করি। তারপর একটা সাময়িক ইচ্ছে হয়েছিল সাহিত্যিক হবার, কিন্তু মা-র ধমকানিতে চাকরির চেষ্টা দেখতে হল। বড় মামার সুপারিশেই চাকরিটা হল, তবে আমারও যে কিছুটা কৃতিত্ব ছিল না তা নয়। ছাত্র হিসেবে আমার রেকর্ডটা ভালোই, ইংরিজিটাও বেশ গড় গড় করে বলতে পারি, আর তাছাড়া আমার মধ্যে একটা আত্মনির্ভরতা ও স্মার্টনেস আছে যেটা ইণ্টারভিউ-এর সময় আমাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করেছিল।

মুঙ্গেরে ছেলেবেলার কথাটা বললে হয়ত আমার চরিত্রের একটা দিক বুঝতে সাহায্য করবে। কলকাতায় একনাগাড়ে বেশিদিন থাকতে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। এত লোকের ভীড়, ট্রামবাসের ঘরঘরানি, এত হৈ হল্লা, জীবনধারণের এত সমস্যা—মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে এইসবের থেকে ছুটে বেরিয়ে চলে যাই। আমার গাড়িটা কেনার পর কয়েকবার এটা করেওছি। ছুটির দিনে একবার ডায়মণ্ড হারবার, একবার পোর্টক্যানিং, আর একবার

দমদমের রাস্তা দিয়ে সেই একেবারে হাসনাবাদ পর্যন্ত ঘুরে এসেছি। একাই গিয়েছি প্রতিবার, কারণ এ ধরনের আউটিং-এ উৎসাহ প্রকাশ করার মত কাউকে খুঁজে পাইনি।

এ থেকে বোঝাই যাবে যে কলকাতা শহরে সত্যি করে বন্ধু আমার তেমন কেউ নেই। তাই প্রমোদের চিঠিটা পেয়ে মনটা খুশিতে ভরে উঠল। প্রমোদ ছিল আমার মুঙ্গেরের সহপাঠী। আমি কলকাতায় চলে আসার পর বছর চারেক আমাদের মধ্যে চিঠি লেখালেখি চলেছিল, তারপর বোধহয় আমার দিক থেকেই সেটা বন্ধ হয়ে যায়। হঠাৎ একদিন আপিস থেকে ফিরতেই চাকর গুরুদাস বলল, মামাবাড়ি থেকে লোক এসে একটা চিঠি দিয়ে গেছে। খামের উপর লেখা দেখেই বুঝলাম প্রমোদ। ডুমকা থেকে লিখছে—'জংলি আপিসে চাকরি করছি…কোয়ারটার্স আছে…দিন সাতেকের ছুটি নিয়ে চলে আয়…।'

ছুটি পাওনা ছিল বেশ কিছুদিনের, তাই যত শীঘ্র সম্ভব আপিসের কাজ গুছিয়ে নিয়ে, গত ২৭শে এপ্রিল—তারিখটা আজীবন মনে থাকবে—তল্পিতল্পা গুটিয়ে, কলকাতার জঞ্জাল ও ঝঞ্ঝাট পিছনে ফেলে রওনা দিলাম ডুমকার উদ্দেশে।

প্রমোদ অবিশ্যি মোটরযোগে ডুমকা যাবার কথা একবারও বলেনি। ওটা আমারই আইডিয়া। দু'শ মাইল রাস্তা, বড় জোর পাঁচ ঘণ্টার ধাক্কা। দশটার মধ্যে ভাত খেয়ে বেরিয়ে পড়ব, দিনের আলো থাকতে থাকতে পৌঁছে যাবো, এই ছিল মতলব।

কাজের বেলা গোড়াতেই একটা হোঁচট খেতে হল। রান্না তৈরি ছিল ঠিক সময়, কিন্তু ভাত খেয়ে সবে মুখে পানটা পুরেছি, এমন সময় বাবার পুরোন বন্ধু মোহিত কাকা এসে হাজির। একে ভারভার্তিক লোক, তার উপর প্রায় দশ বছর পরে দেখা: মুখ ফুটে কিছুতেই বলতে পারলাম না আমার তাড়া আছে। ভদ্রলোককে চা খাওয়াতে হল, তারপর ঝাড়া একঘণ্টা ধরে তার

সুখদুঃখের কাহিনী শুনতে হল।

মোহিত কাকাকে বিদায় দিয়ে গাড়িতে মাল তুলে যখন নিজে উঠতে যাচ্ছি তখন দেখি আমার একতলার ভাড়াটে ভোলাবাবু তার চার বছরের ছেলে পিণ্টুর হাত ধরে কোত্থেকে যেন বাড়ি ফিরছেন। আমায় দেখে বললেন, 'একা একা কোথায় পাড়ি দিচ্ছেন?'

আমার উত্তর শুনে ভদ্রলোক একটু উদ্বিগ্নভাবেই বললেন, 'এতটা পথ মোটরে একা যাবেন? অন্তত এই ট্রিপটার জন্য একটা ড্রাইভার-ট্রাইভারের বন্দোবস্ত করলে হত না?'

আমি বললাম, 'চালক হিসেবে আমি খুব হুঁশিয়ার, আর আমার যত্নের ফলে গাড়িটাও প্রায় নতুনই রয়েছে, তাই ভাবনার কিছু নেই।' ভদ্রলোক 'বেস্ট্ অফ লাক' বলে ছেলের হাত ধরে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়লেন।

গাড়িতে বসে স্টার্ট নেবার আগে হাত ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি - পৌনে এগারটা।

হাওড়া দিয়ে না গিয়ে বালি ব্রিজের রাস্তা নেওয়া সত্ত্বেও, চন্দননগর পৌঁছতেই লাগল দেড় ঘণ্টা। এই তিরিশটা মাইল পেরোতে এত ঝক্কি, রাস্তা এত বাজে ও আনরোমান্টিক যে মোটর-যাত্রার প্রায় ষোলআনা উৎসাহ উবে যায়। কিন্তু তার ঠিক পরেই শহর পিছনে ফেলে গাড়ি যখন ছোটে মাঠের মধ্যে দিয়ে, তখন সেটা কাজ করে একেবারে ম্যাজিকের মত। মন তখন বলে—এর জন্যেই ত আসা! কোথায় ছিল অ্যাদ্দিন এই চিমনির ধোঁয়া-বর্জিত মসৃণ আকাশ, এই মাটির গন্ধ মেশানো মনমাতানো বিশুদ্ধ মেঠো বাতাস?

দেড়টা নাগাদ যখন বর্ধমানের কাছাকাছি পৌঁছেছি, তখন পেটে একটা খিদের ভাব অনুভব করলাম। সঙ্গে কমলালেবু আছে, ফ্লাস্কে গরম চা আছে, কিন্তু মন চাইছে অন্য কিছু। রাস্তার

পাশেই স্টেশন; গাড়ি থামিয়ে রেষ্টোর‍্যাণ্টে গিয়ে দুটো টোস্ট, একটা অমলেট ও এক পেয়ালা কফি খেয়ে আবার রওনা দিলাম। পথ বাকি এখনো একশো তিরিশ মাইল।

বর্ধমান থেকে পঁচিশ মাইল গিয়ে পানাগড় পড়ে। সেখান থেকে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ছেড়ে ইলামবাজারের রাস্তা নিতে হবে। ইলামবাজার থেকে শিউড়ি হয়ে ম্যাসানজোর পেরিয়ে দুমকা।

পানাগড়ের মিলিটারি ক্যাম্পগুলো সবে দৃষ্টিগোচর হয়েছে, এমন সময় আমার গাড়ির পিছনের দিক থেকে একটা বেলুন ফাটার মত শব্দ হল, আর সেই সঙ্গে গাড়িটা একপাশে একটু কেদ্‌রে গেল। কারণ অবিশ্যি সহজেই বোধগম্য।

গাড়ি থেকে নেমে সামনের দিকে চেয়ে বুঝতে পারলাম শহর এখনও অনেক মাইল দূরে। কাছাকাছির মধ্যে মেরামতির দোকানের আশাটা মন থেকে মুছে ফেলতে হল। সঙ্গে যে 'স্টেপ্‌নী' ছিল না তা নয়, আর জ্যাক্ দিয়ে গাড়ি তুলে ফাটা টায়ার খুলে ফেলে তার জায়গায় নতুন টায়ার পরানো আমার অসাধ্য কিছু নয়। তবু, এক্ষেত্রে পরিশ্রম এড়ানোর ইচ্ছেটা অস্বাভাবিক নয়। আর গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গাড়িতে টায়ার পরাব—পাশ দিয়ে হুশ্‌ হুশ্‌ করে অন্য কত গাড়ি বেরিয়ে যাবে, আর আমার শোচনীয় হাস্যকর অবস্থাটা তারা দেখে ফেলবে—এটা ভাবতে মোটেই ভালো লাগছিল না। কিন্তু কী আর করা? দশ মিনিট এদিক ওদিক চেয়ে ঘোরাফেরা করে গঙ্গা বলে কাজে লেগে পড়লাম।

নতুন টায়ার লাগিয়ে ফাটা টায়ার ক্যারিয়ারে ভরে ডালা বন্ধ করে যখন সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালাম, তখন সার্টটা ঘামে ভিজে শরীরের সঙ্গে সেঁটে গেছে। ঘড়িতে দেখি আড়াইটা বেজে গেছে। আবহাওয়াতে একটা গুমোট ভাব। ঘণ্টাখানেক আগেও সুন্দর হাওয়া বইছিল; গাড়ি থেকে দেখছিলাম বাঁশঝাড়ের মাথাগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ছে। এখন চারিদিক থমথমে। গাড়িতে

ওঠার সময় পশ্চিমের আকাশের নিচের দিকে দূরের গাছপালার মাথায় একটা কালচে নীলের আভাস লক্ষ্য করলাম। মেঘ। ঝড়ের মেঘ কি? কালবৈশাখী? ভেবে লাভ নেই। স্পীডোমিটারের কাঁটা আরো চড়াতে হবে। ফ্লাস্ক্‌টা খুলে খানিকটা গরম চা মুখে ঢেলে আবার রওনা দিলাম।

ইলামবাজার পেরোতে না পেরোতেই ঝড়টা এসে পড়ল। ঘরে বসে যে জিনিস চিরকাল সানন্দে উপভোগ করেছি—যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেছি, গান করেছি—সেই জিনিসই খোলা মাঠের মধ্যে পিচের রাস্তায় চলন্ত গাড়িতে যে কী বিভীষিকার সৃষ্টি করতে পারে তা কল্পনা করতে পারিনি। আর বাজ জিনিসটাকে কেন জানি কোনদিনই আমি বরদাস্ত করতে পারি না। ওটাকে প্রকৃতির একটা শয়তানি বলে মনে হয়। অসহায় মানুষকে এক নির্মম রসিকতায় নাজেহাল করার ভাব নিয়ে যেন এই বাজের খেলা। এদিকে আচমকা বৈদ্যুতিক শরনিক্ষেপ, আর পরমুহূর্তেই কর্ণপটাহ বিদীর্ণ করা দামামা গর্জন—গুড় গুড় গুড় গুড় কড়কড় কড়াৎ। এক এক সময় মনে হচ্ছে যে আমার এই নিরীহ অ্যাম্বাসাডর গাড়িকেই ত্যাগ করে বিদ্যুৎবাণ নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, এবং আরেকটু মনোযোগ দিয়ে কাজটা করলেই লক্ষ্যভেদ হয়ে যাবে।

এই দুর্যোগের মধ্যেই কোনমতে যখন শিউড়ি ছাড়িয়ে ম্যাসানজোরের পথে পড়েছি, তখন হঠাৎ একটা বিস্ফোরণের শব্দ হল যেটা কোনমতেই বজ্রপাত বলে ভুল করা চলে না। বুঝলাম আমার গাড়ির আরেকটি টায়ার কাজে ইস্তফা দিলেন।

হাল ছেড়ে দিলাম। মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা। গত বিশ মাইল স্পীডমিটারের কাঁটাকে পনর থেকে পঁচিশের মধ্যে রাখতে হয়েছে। নাহলে এতক্ষণে ম্যাসানজোর

ছাড়িয়ে যাওয়ার কথা। কোথায় এসে পৌঁছলাম? সামনের দিকে চেয়ে কিছু বোঝার উপায় নেই। কাঁচের উপর জলপ্রপাত। ওয়াইপারটা সপাৎ সপাৎ শব্দ করে চলেছে, কিন্তু সেটাকে কাজ না বলে খেলা বলা ভালো। নিয়মিত এপ্রিল মাসে এখানো সূর্যের আলো থাকার কথা, কিন্তু ভাব দেখে মনে হয় রাত হল বলে।

আমার ডানপাশের দরজাটা একটু ফাঁক করে বাইরের দিকে চাইলাম। যা দেখলাম তাতে মনে হল কাছাকাছির মধ্যে ঘন বসতি না থাকলেও, দু-একটা পাকাবাড়ি যেন গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে। গাড়ি থেকে নেমে যে একটু এদিক ওদিক ঘুরে দেখব তার উপায় নেই। তবে সেটা না দেখেও যে জিনিসটা বলা যায় সেটা হল এই যে, মাইল খানেকের মধ্যে বাজার বা দোকান বলে কোন পদার্থ নেই।

আর আমার সঙ্গে বাড়তি টায়ারও আর নেই।

মিনিট পনের গাড়িতে বসে থাকার পর একটা প্রশ্ন মনে জাগল: এতখানি সময়ের মধ্যে একটি গাড়ি বা একটি মানুষও আমার গাড়ির পাশ দিয়ে গেল না। তবে কি ভুল পথে এসে পড়েছি? সঙ্গে রোড ম্যাপ আছে। শিউড়ি পর্যন্ত ঠিক এসেছি জানি, কিন্তু তারপরে যদি কোনো ভুল রাস্তায় মোড় ঘুরে থাকি? এই চোখধাঁধানো বৃষ্টিতে সেটা খুব অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু যদি বা ভুল হয়ে থাকে—এটা তো আফ্রিকা বা দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গল নয় যে; দিশেহারা হয়ে পড়তে হবে! যেখানেই এসে থাকি না কেন, এটা বীরভূমেরই মধ্যে, শান্তিনিকেতন থেকে মাইল পঞ্চাশের বেশি দূর নয়, বৃষ্টি থামলেই সব মুশকিল আসান হয়ে যাবে, এমনকি হয়ত মাইল খানেকের মধ্যে একটা গাড়ি মেরামতের দোকানও পেয়ে যাবো।

পকেট থেকে উইলস-এর প্যাকেট আর দেশলাই বার করে একটা সিগারেট ধরালাম। ভোলাবাবুর কথা মনে পড়ল। ভদ্র-

লোক নিশ্চয়ই ভুক্তভোগী—নইলে এমন খাঁটি উপদেশ দেন কী করে? ভবিষ্যতে—

পঁ্যা—ক্ পঁ্যা—ক্ পঁ্যা—ক্!

একটা তন্দ্রার ভাব এসে গিয়েছিল, হর্নের শব্দে সজাগ হয়ে উঠে বসলাম। বৃষ্টিটা একটু ধরেছে। তবে অন্ধকার গাঢ়তর।

পঁ্যা—ক্ পঁ্যা—ক্ পঁ্যা—ক্!

পিছন ফিরে দেখি একটা লরি এসে দাঁড়িয়েছে। হর্ন দিচ্ছে কেন? আমি কি রাস্তার পুরোটা দখল করে আছি নাকি?

দরজা খুলে নেমে দেখি লরির দোষ নেই। টায়ার ফাটার সময় গাড়িটা খানিকটা ঘুরে গিয়ে রাস্তার পুরোটা না হলেও প্রায় আধখানা আটকে রেখেছে—লরি যাবার জায়গা নেই।

'গাড়ি সাইড কীজিয়ে—সাইড কীজিয়ে!'

আমার অসহায় ভাব দেখেই বোধ হয় পাঞ্জাবী ড্রাইভারটি নেমে এলেন।

'কেয়া হুয়া? পাংচার?'

আমি ফরাসী কায়দায় কাঁধ দুটোকে একটু উঁচিয়ে আমার শোচনীয় অবস্থাটা বুঝিয়ে দিলাম। বললাম, 'আপনি যদি একটু হাত লাগান তাহলে এটাকে এক পাশে সরিয়ে আপনার যাবার জায়গা করে দিতে পারি।'

এবার লরি থেকে পাঁইজীর সহকারী নেমে এলেন। তিন জনে ঠেলে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে গাড়িটাকে একপাশে করে দিলাম। তারপর জিজ্ঞেস করে জানলাম যে, এটা দুমকার রাস্তা নয়। আমি ভুল পথে এসে গেছি, তবে সেটা মাইল তিনেকের বেশি নয়। কাছাকাছির মধ্যে গাড়ি সারানোর কোন দোকান নেই।

লরি চলে গেল। তার ঘর ঘর শব্দ মিলিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশাল নৈঃশব্দ্যের সৃষ্টি হল, আর আমি বুঝলাম যে আমি অকূল পাথারে পড়েছি।

আজ রাত্রের মধ্যে তুমকা পৌঁছানর বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই, এবং রাতটা কীভাবে কাটবে তার কোনো ইঙ্গিত নেই।

আশেপাশের ডোবা থেকে ব্যাঙের কোরাস আরম্ভ হয়েছে। বৃষ্টিটা কমের দিকে। অন্য সময় হলে মাটির সোঁদা গন্ধে মনটা মেতে উঠত, কিন্তু এ অবস্থায় নয়।

আবার গাড়িতে উঠলাম। কিন্তু তাতেই বা কী লাভ? হাত পা ছড়িয়ে আরাম করার পক্ষে অ্যাম্বাসাডর গাড়ির মত অনুপযুক্ত আর কিছু আছে কি? বোধ হয় না।

আরেকটা সিগারেট ধরাতে যাব, এমন সময় হঠাৎ পাশের জানলা দিয়ে একটা ক্ষীণ আলো এসে স্টিয়ারিং হুইলটার উপর পড়ল। আবার দরজা খুলে গলা বাড়িয়ে দেখি গাছের ফাঁক দিয়ে একটা আলোর চতুষ্কোণ দেখা যাচ্ছে। বোধহয় জানলা। ধোঁয়ার কারণ আগুন, কেরোসিনের আলোর কারণ মানুষ। কাছাকাছি বাড়ি আছে, এবং তাতে মানুষ আছে।

টর্চটা নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। আলোর দূরত্ব বেশি নয়। আমার উচিত এগিয়ে অনুসন্ধান করা। একটা রাস্তাও রয়েছে, অপরিসর পথ, সেটা বোধহয় আলোরই দিক থেকে, আমি যে রাস্তায় আছি সেটায় এসে পড়েছে। পথের দু'পাশে গাছপালার বন, তলার দিকে আগাছার জঙ্গল।

কুছ পরোয়া নেহি। গাড়ির দরজা লক্ করে রওনা দিলাম।

যতদূর সম্ভব খানাখন্দ বাঁচিয়ে জল কাদার মধ্যে দিয়ে ছপাৎ ছপাৎ করে খানিকদূর হেঁটে একটা তেঁতুলগাছ পেরোতেই বাড়িটা চোখে পড়ল। বাড়ি বলা ভুল হবে—একখানা কি দেড়খানা ইটের ঘরের উপর একটা টিনের চালা। ফাঁক করা দরজা দিয়ে ঘরের ভিতর একটা জ্বালানো লণ্ঠন, একটা ধোঁয়াটে ভাব, আর একটা খাটিয়ার কোণ লক্ষ্য করলাম।

'কোই হ্যায়?'

একটা মাঝবয়সী বেঁটে গোঁফওয়ালা লোক বেরিয়ে এসে আমার টর্চের আলোর দিকে ভুরু কুঁচকে চাইল। আমি আলোটা নামিয়ে নিলাম।

'কাঁহাসে আয়া বাবু?'

আমার দুর্ঘটনার কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করে বললাম, 'এখানে কাছাকাছির মধ্যে রাত কাটানোর কোন বন্দোবস্ত হতে পারে? যা পয়সা লাগে আমি দেবো।'

'ডাক বাংলামে?'

ডাক বাংলো? সে আবার কোথায়?

প্রশ্নটা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমার বোকামোটা বুঝতে পারলাম। এতক্ষণ কেবল লণ্ঠন আর টর্চের আলোর দিকে দৃষ্টি থাকার ফলে আশেপাশে কি আছে দেখিনি। এবার টর্চটাকে ঘুরিয়ে আমার বাঁ দিকে ফেলতেই একটা বেশ বড় একতলা পুরোন বাড়ি চোখে পড়ল। সেটা দেখিয়ে বললাম, 'এটাই ডাক বাংলো?'

'হাঁ বাবু। লেকিন বিস্তারা কুছ নেহি হ্যায়, খানা ভি নেহি মিলেগা।'

'বিছানা আমার সঙ্গে আছে। খাট হবে তো?'

'খাটিয়া হোগা।'

'আর তোমার ঘরে উনুন ধরিয়েছ দেখছি। তুমি নিজে খাবে নিশ্চয়ই।'

লোকটা হেসে ফেলল। তার হাতের সেঁকা মোটা রুটি, আর তার বৌয়ের রান্না উরুৎ কা ডাল কি আমার চলবে! সব রকম রুটিই আমার চলে, আর উরুৎ কা ডাল তো আমার অতি প্রিয় খাদ্য!

এককালে কী ছিল জানি না, এখন নামেই ডাক বাংলো। স৮৮৷ পুরোন সাহেবী আমলের বাড়ি, তাই ঘরের সাইজ বড়, যে আমি লিংটা পেল্লায় উঁচু। আসবাব বলতে একটি পুরোন

নেয়ারের খাট, একপাশে একটা টেবিল, আর তার সামনে হাতল ভাঙা একটা চেয়ার।

চৌকিদার আমার জন্য একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে এনে টেবিলের উপর রাখল। বললাম, 'তোমার নাম কী হে?'

'সুখনরাম, বাবুজী।'

'এ বাংলোয় লোকজন কোনোকালে এসেছে, না আমিই প্রথম?'

সুখনরামের রসবোধ আছে। সে হেসে ফেলল। বললাম, 'ভূতটুত নেই তো?'

আরে রাম, রাম! কত লোকই তো এসে থেকে গেছে—কই, এমন অপবাদ তো কেউ দেয়নি।

এ কথায় একটু যে আশ্বস্ত হইনি তা বলতে পারি না। ভূতে বিশ্বাস করি বা না করি, এটুকু অন্তত জানি যে ভূত যদি থাকেই এ বাংলোতে, তাহলে সে সব সময়ই থাকবে, আর না থাকলে কোন সময়ই থাকবে না। বললাম, 'এটা কদ্দিনের পুরনো বাড়ি?'

সুখন আমার বেডিং খুলে দিতে দিতে বলল, 'পহিলে ইয়ে নীল কোঠি থা। এক নীলকা ফেক্টরি ভী থা নজদিগমে। উস্‌কা এক চিমনি আভি তক্ খাড়া হ্যায়; আউর সব টুট গিয়া।'

এ অঞ্চলে যে এককালে নীলের চাষ হত সেটা জানতাম। মুঙ্গেরের আশেপাশেও ছেলেবেলায় পুরোন ভাঙা নীলকুঠি দেখেছি।

সুখনের তৈরি রুটি আর কলাইয়ের ডাল খেয়ে নেয়ারের খাটে বিছানা পেতে যখন শুলাম তখন রাত সাড়ে দশটা। প্রমোদকে আজ বিকেলে পৌঁছব বলে টেলিগ্রাম করেছিলাম, ও একটু চিন্তিত হবে অবশ্যই। কিন্তু সে নিয়ে ভেবে লাভ নেই। একটা আস্তানা যে পেয়েছি, এবং বেশ সহজেই পেয়েছি, সেটা কম ভাগ্যের কথা নয়। ভবিষ্যতে ভোলাবাবুর উপদেশ মেনে চলব। উচিত শিক্ষা হয়েছে আমার। তবে এটাও ঠিক যে এমনি

শেখার চেয়ে ঠেকে শেখার দাম অনেক বেশি।

লণ্ঠনটা পাশের বাথরুমে রেখে এসেছি। দরজার ফাঁক দিয়ে যেটুকু আলো এসেছে তাই যথেষ্ট। ঘরে বেশি আলো থাকলে আমার ঘুম আসে না, অথচ এখন যে জিনিসটার সবচেয়ে বেশি দরকার সেটা হল ঘুম। গাড়ি থেকে জিনিসপত্র সব বার করে নিয়ে সেটা লক্ করে এসেছি, বলা বাহুল্য। একটু জোর গলায় বলতে পারি যে, আজকালকার দিনে কলকাতার রাস্তায় গাড়ি ফেলে রাখা যতটা বিপজ্জনক, গ্রামের রাস্তায় তার চেয়ে হয়ত কিছুটা কমই।

বাইরে বৃষ্টির শব্দ থেমে গেছে। ব্যাঙ আর ঝিঁঝির সমবেত কণ্ঠস্বরে রাত মুখর হয়ে উঠেছে। শহরের জীবনটা এত দূরে আর এত পিছনে সরে গেছে যে, সেটাকে একটা প্রাগৈতিহাসিক পর্ব বলে মনে হচ্ছে। নীলকুঠি!···দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের কথা মনে পড়ল। কলেজে থাকতে অভিনয় দেখেছিলাম··· কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের কোন এক পেশাদারী থিয়েটারে···

ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। কতক্ষণ পরে তা জানি না।

দরজায় একটা খচ্ মচ্ শব্দ হচ্ছে। ভেতরে ছুড়কো দেওয়া; বুঝলাম বাইরে থেকে কুকুর বা শেয়াল জাতীয় একটা কিছু নখ দিয়ে সেটাকে আঁচড়াচ্ছে। মিনিট খানেক পরে আওয়াজটা থেমে গেল। আবার সব চুপচাপ।

চোখ বুঁজলাম, কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্য। একটা কুকুরের ডাকে ঘুমটা একেবারে গেল।

বাংলার গ্রাম্য নেড়িকুত্তার ডাক এটা নয়। এ হল বিলিতি হাউণ্ডের হুঙ্কার। এ ডাক আমার অচেনা নয়। মুঙ্গেরে আমাদের বাড়ির দুটো বাড়ি পরেই মার্টিন সাহেবের বাড়ি থেকে রাত্রে এ

ডাক শুনতে পেতাম। এ তল্লাটে এমন কুকুর কে পুষবে? একবার মনে হল উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখি—কারণ কুকুরটা ডাক বাংলোর খুব কাছেই রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। তারপর মনে হল, সামান্য একটা কুকুরের ডাক নিয়ে এতটা মাথা ঘামানোর কোন মানেই হয় না। তার চেয়ে আবার ঘুমনোর চেষ্টা দেখা যাক্। রাত ক'টা হল?

জানালা দিয়ে অল্প চাঁদের আলো আসছে। শোয়া অবস্থাতেই বাঁ হাতটা তুলে মুখের সামনে আনতেই বুকটা ধড়াস্ করে উঠল।

হাতে ঘড়ি নেই।

অথচ অটোম্যাটিক ঘড়ি যত প'রে থাকা যায় ততই ভালো বলে ওটা শোবার সময়ও কক্ষনো খুলে শুই না। ঘড়ি কোথায় গেল? শেষটায় কি ডাকাতের আস্তানায় এসে পড়লাম নাকি? তাহলে আমার গাড়ির কী হবে?

বালিশের পাশে হাতড়িয়ে টর্চটা খুঁজতে গিয়ে দেখি সেটাও নেই।

এক লাফে বিছানা থেকে উঠে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে খাটের নিচে তাকিয়ে দেখি স্যুটকেশটাও উধাও।

মাথা গরম হয়ে এল। এর একটা বিহিত করতেই হবে। হাঁক দিলাম—

'চৌকিদার!'

কোন উত্তর নেই।

বারান্দায় যাবো বলে দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে খেয়াল হল যে হুড়কোটাকে যেমন ভাবে লাগিয়ে শুয়েছিলাম, ঠিক তেমনিই আছে। জানালাতেও গরাদ—তবে চোর এল কোথা দিয়ে?

দরজার হুড়কোটা খুলতে আমার নিজের হাতের উপর চোখ পড়ে কেমন জানি খট্কা লাগল।

হাতে কি দেয়াল থেকে চুণ লেগেছে—না পাউডার জাতীয়

কিছু ? এমন ফ্যাকাসে লাগছে কেন ?

আর আমি তো গেঞ্জি পরে শুয়েছিলাম—তাহলে আমার গায়ে লম্বা হাতা সিল্কের সার্ট কেন ?

মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। দরজা খুলে বাইরে এলাম।

'ছাউখিডা-র !'

নিজের গলার স্বর চিনতে পারলাম না। উচ্চারণও না। যতই মিশনারি ইস্কুলে পড়ি না কেন—বাংলা উচ্চারণে উগ্র সাহেবিয়ানা আমার কোন দিন ছিল না।

আর চৌকিদারই বা কোথায়, আর কোথায়ই বা তার ঘর। বাংলোর সামনে ধূ ধূ করছে মাঠ। দূরে আবছা একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে, তার পাশে একটা চিমনির মতন স্তম্ভ। চারিদিকে অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা।

আমার পরিবেশ বদলে গেছে।

আমি নিজেও বদলে গেছি।

ঘর্মাক্ত অবস্থায় ঘরে ফিরে এলাম। চোখটা অন্ধকারে অভ্যস্থ হয়ে গেছে। ঘরের সব কিছুই এখন দেখতে পাচ্ছি। খাট আছে—তাতে মশারি নেই—অথচ আমি মশারি টাঙিয়ে শুয়েছিলাম। বালিশ যেটা রয়েছে সেটাও আমার নয়। আমারটা ছিল সাধারণ, এটার পাশে বাহারের কুঁচি দেওয়া বর্ডার। খাটের ডান দিকের দেওয়ালের সামনে সেই টেবিল, সেই চেয়ার—কিন্তু তাতে প্রাচীনত্বের কোন চিহ্ন নেই। আবছা আলোতেও তার বার্ণিশ করা কাঠটা চক্ চক্ করছে। টেবিলের উপর রাখা রয়েছে—লণ্ঠন নয়—বাহারের শেডওয়ালা কাজ করা কেরোসিন ল্যাম্প।

আরো জিনিসপত্র রয়েছে ঘরে—সেগুলো ক্রমে দৃষ্টিগোচর হল। এক কোণায় দুটো ট্রাঙ্ক। দেওয়ালে একটা আলনা, তা থেকে ঝুলছে একটা কোট, একটা অদ্ভুত অচেনা ধরনের টুপি, আর একটা হাণ্টার চাবুক। আলনার নিচে এক জোড়া হাঁটু অবধি উঁচু জুতো—

যাকে বলে goloshes।

জিনিসপত্র ছেড়ে আরেকবার আমার নিজের দিকে দৃষ্টি দিলাম। এর আগে শুধু সিল্কের সার্টটা লক্ষ্য করেছিলাম। এখন দেখলাম তার নিচে রয়েছে সরু চাপা প্যাণ্ট। আরো নিচে মোজা। পায়ে জুতো নেই, তবে খাটের পাশেই দেখলাম এক জোড়া কালো চামড়ার বুট রাখা রয়েছে।

আমার ডান হাতটা এবার আমার মুখের উপর বুলিয়ে বুঝতে পারলাম, শুধু গায়ের রং ছাড়াও আমার চেহারার আরো পরিবর্তন হয়েছে। এত চোখা নাক, এত পাতলা ঠোঁট আর সরু চোয়াল আমার নয়। মাথায় হাত দিয়ে দেখি ঢেউ খেলানো চুল পিছনে কাঁধ অবধি নেমে এসেছে। কানের পাশে ঝুলপি নেমে এসেছে প্রায় চোয়াল পর্যন্ত।

বিস্ময় ও আতঙ্কের সঙ্গে সঙ্গে একটা উগ্র কৌতূহল হল আমার নিজের চেহারাটা দেখার জন্য। কিন্তু আয়না? আয়না কোথায়?

রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ে গিয়ে এক ধাক্কায় বাথরুমের দরজাটা খুলে ভিতরে ঢুকলাম।

আগে দেখেছিলাম একটিমাত্র বালতি ছাড়া সেখানে আর কিছু নেই। এখন দেখি মেঝের এক কোণে একটা টিনের বাথটাব, তার পাশে চৌকি আর এনামেলের মগ। যে জিনিসটা খুঁজ-ছিলাম সেটা রয়েছে আমার ঠিক সামনেই—একটা কাঠের ড্রেসিং টেবিলের উপর লাগানো একটা ওভালশেপের আয়না। আমি জানি আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছি—কিন্তু যে চেহারাটা তাতে প্রতিফলিত হয়েছে সেটা আমার নয়। কোনো এক বীভৎস ভৌতিক ভেল্‌কির ফলে আমি হয়ে গেছি ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন সাহেব—তার গায়ের রং ফ্যাকাশে ফরসা, চুল সোনালি, চোখ কটা এবং সে চোখের চাহনিতে ক্লেশের সঙ্গে

কাঠিন্যের ভাব অদ্ভুত ভাবে মিশেছে। কত বয়স এ সাহেবের? ত্রিশের বেশি নয়, তবে দেখে মনে হয় অসুস্থতা কিংবা অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য অকালেই বার্ধক্যের ছাপ পড়েছে।

কাছে গিয়ে আরো ভালো করে 'আমার' মুখটা দেখলাম। চেয়ে থাকতে থাকতে একটা দীর্ঘশ্বাস বুকের ভিতর থেকে উঠে এল।

'ওঃ!'

এ কণ্ঠস্বর আমার নয়। এই দীর্ঘশ্বাসও সাহেবেরই মনের ভাব ব্যক্ত করছে—আমার নয়।

এর পরে যা ঘটল, তাতে বুঝলাম যে শুধু গলার স্বর নয়, আমার হাত পা সবই অন্য কারুর অধীনে কাজ করছে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, আমি—অনিরুদ্ধ বোস—যে বদলে গেছি—সে জ্ঞানটা আমার আছে। অথচ এই পরিবর্তনটা ক্ষণস্থায়ী না চিরস্থায়ী, এ থেকে নিজের অবস্থায় ফিরে আসার কোন উপায় আছে কিনা, তা আমার জানা নেই।

বাথরুম থেকে শোবার ঘরে ফিরে এলাম।

আবার রাইটিং টেবিলের দিকে চোখ পড়ল। ল্যাম্পটা এখন জ্বলছে। ল্যাম্পের নিচে খোলা অবস্থায় একটা চামড়া দিয়ে বাঁধানো খাতা। তার পাশে একটা দোয়াতে ডোবানো রয়েছে একটা খাগের কলম।

টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলাম। খাতার খোলা পাতায় কিছু লেখা হয়নি। কোনো এক অদৃশ্য শক্তি আমাকে চেয়ারে বসিয়ে দোয়াত থেকে কলমটা আমার ডান হাত দিয়ে তুলিয়ে নিল। সে এবার খাতার বাঁ দিকে সাদা পাতার দিকে অগ্রসর হল। ঘরের নিস্তব্ধতা ভেদ করে খস্‌খস্‌ শব্দ করে খাগের কলম লিখে চলল:

২৭শে এপ্রিল, ১৮৬৮

কানের কাছে আবার সেই রাক্ষুসে মশার বিনবিনুনি আরম্ভ

হয়েছে। শেষটায় এই সামান্য একটা পোকার হাতে আমার মত একটা জাঁদরেল ব্রিটিশারকে পরাহত হতে হল? ভগবানের এ কেমন বিধি? এরিক পালিয়েছে। পার্সি আর টোনিও আগেই ভেগেছে। আমার বোধহয় ওদের চেয়েও বেশি টাকার লোভ, তাই বার বার ম্যালেরিয়ার আক্রমণ সত্ত্বেও নীলের মোহ কাটাতে পারিনি। না—শুধু তাই নয়। ডায়রিতে মিথ্যে কথ বলা পাপ। আরেকটা কারণ আছে। আমার দেশের লোক আমাকে হাড়ে হাড়ে চেনে। সেখানে থাকতেও তো কম কুকীর্তি করিনি – আর তারা সেকথা ভোলেও নি। তাই ইংলণ্ডে ফিরে যাবার সাহস নেই। বুঝতে পারছি এখানেই থাকতে হবে। আর এখানেই মরতে হবে। মেরি আর আমার তিন বছরের শিশু সন্তান টোবির কবরের পাশেই আমার স্থান হবে। এত অত্যাচার করেছি এখানকার স্থানীয় নেটিভদের উপর যে, আমার মৃত্যুতে চোখের জল ফেলার মত একটি লোকও নেই এখানে। এক যদি মীরজান কাঁদে। আমার বিশ্বস্ত অনুগত বেয়ারা মীরজান!

আর রেক্স? আসল ভাবনা তো রেক্সকে নিয়েই। হায় প্রভুভক্ত কুকুর। আমি মরে গেলে তোকে এরা আস্ত রাখবে না রে! হয় ঢিল মেরে না হয় লাঠির বাড়ি মেরে তোর প্রাণ শেষ করবে এরা। তোর যদি একটা ব্যবস্থা করে যেতে পারতাম!…

আর লিখতে পারলাম না। হাত কাঁপছে। আমার হাত নয়—ডায়রি লেখকের।

কলম রেখে দিলাম।

এবার আমার ডান হাতটা টেবিলের উপর থেকে নেমে কোলের কাছে এসে ডান দিকে গেল।

একটা দেরাজের হাতল।

হাতের টানে দেরাজ খুলে গেল।

ভিতরে একটা পিনকুশন, একটা পিতলের পেপার ওয়েট, একটা পাইপ, কিছু কাগজপত্তর।

আরো খানিকটা খুলে গেল দেরাজ। একটা লোহার জিনিস চক্ চক্ করে উঠল। পিস্তল! তার হাতলে হাতির দাঁতের কাজ।

আমার হাত পিস্তলটাকে বার করে নিল। হাতের কাঁপুনি থেমে গেল।

বাইরে শেয়াল ডাকছে। সেই শেয়ালের ডাকের প্রত্যুত্তরেই যেন গর্জিয়ে উঠল হাউণ্ডের কণ্ঠস্বর—ঘেউ ঘেউ ঘেউ!

চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজার দিকে গেলাম। দরজা খুলে বাইরে।

সামনের মাঠে চাঁদের আলো।

বাংলোর বারান্দা থেকে হাত বিশেক দূরে ছাই রং-এর একটা প্রকাণ্ড গ্রে হাউণ্ড ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে। আমি বাইরে আসা মাত্র আমার দিকে ফিরে লেজ নাড়তে লাগল।

'রেক্স!'

সেই গম্ভীর ইংরেজ কণ্ঠস্বর। দূরে বাঁশবন ও নীলের ফ্যাক্টরির দিক থেকে ডাকটা প্রতিধ্বনিত হয়ে এল—রেক্স!...রেক্স!...

রেক্স এগিয়ে এল—তার লেজ নড়ছে।

ঘাস থেকে বারান্দায় ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমার ডান হাত কোমরের কাছে উঠে এল—পিস্তলের মুখ কুকুরের দিকে। রেক্স যেন থমকে গেল। তার জ্বলন্ত চোখে একটা অবাক ভাব।

আমার ডান তর্জনী পিস্তলের ঘোড়া টিপে দিল।

বিস্ফোরণের সঙ্গে একটা চোখ ঝলসানো আলো, একটা ধোঁয়া আর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া বারুদের গন্ধ।

রেক্সের দেহের সামনের অংশ বারান্দার উপর ও পিছনটা ঘাসের উপর এলিয়ে পড়েছে।

পিস্তলের শব্দ শুনে কাক ডেকে উঠেছে দূরের গাছপালা থেকে। ফ্যাক্টরির দিক থেকে কিছু লোক যেন ছুটে আসছে বাংলোর দিকে।

ঘরে ফিরে এসে দরজায় হুড়কো লাগিয়ে খাটের উপর এসে বসলাম। বাইরে লোকের গোলমাল এগিয়ে আসছে।

পিস্তলের নলটা আমার কানের পাশে ঠেকাতে বুঝলাম সেটা বেশ গরম।

তারপর আর কিছু জানি না।

*

দরজা ধাক্কানিতে ঘুম ভেঙে গেল।

'চা লিয়ায়া বাবুজী!'

ঘরে দিনের আলো। চিরকালের অভ্যাসমত দৃষ্টি আপনা থেকে বাঁ হাতের কবজির দিকে চলে গেল।

ছ'টা বেজে তেরো মিনিট। ঘড়ি চোখের আরো কাছে আনলাম—কারণ তারিখটাও দেখা যায় এতে।

আটাশে এপ্রিল।

বাইরে থেকে সুখনরাম বলছে, আপকা গাড়ি ঠিক হো গিয়া বাবুজী।

বীরভূমের নীলকর সাহেবের মৃত্যুশতবার্ষিকীতে আমার অভিজ্ঞতার কথা কি কেউ বিশ্বাস করবে?

আমার মনে পড়ল, সাসারাম স্টেশনে লোকটা ওঠা মাত্র
আমাদের আলো দপ্ করে নিভে গিয়েছিল

সেই আশ্চর্য লোকটি

বিমল কর

অনেকদিন আগেকার কথা, অন্তত বছর পঁয়ত্রিশ। আমার তখন পনেরো ষোলো বছর বয়েস। ঠাকুরমা আর ছোট কাকার সঙ্গে কাশী গিয়েছিলাম বেড়াতে, ফেরার সময় এমন একটা কাণ্ড ঘটেছিল যার কোন অর্থ আমরা কেউই খুঁজে পাইনি। আজও পাই না।

কোন্ গাড়ি, কী তার নাম ছিল, আজ আমার কিছু মনে নেই। দুপুর নাগাদ আমরা কাশী থেকে মোগলসরাই স্টেশনে এসে রেলে চড়েছিলাম। তখন ওইদিককার রেলের নাম ছিল ই আই আর—মানে ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে। এখনকার মতন মাত্র দুটো ক্লাস তখন ছিল না, ছিল চারটে। ফার্স্ট, সেকেণ্ড, ইণ্টার, থার্ড। আজকাল রেলের কামরা মানেই যেন একটা ছোটখাট মেলা, গিশগিশ করে লোক। তখনকার দিনে এত ভিড়টিড় কোনো গাড়িতেই থাকত না, মেল এক্সপ্রেস গাড়িতে তো নয়ই।

আমাদের গাড়িটা বোধহয় এক্সপ্রেস গাড়ি ছিল, কেননা সব স্টেশনে থামছিল না। দুপুরের শেষদিকে গাড়িতে উঠেছি। ইণ্টার ক্লাস কামরা। জনা ছয় মাত্র যাত্রী আমাদের কামরায়। দিন দুই পরে কালী পুজো। দুর্গা পুজোর পর গিয়েছিলাম কাশীতে,

ফিরছি কালীপুজোর আগে। আসব ধানবাদ। বাবার কাছে, নিজেদের বাড়িতে।

সাসারাম এসে পৌঁছতেই সন্ধে হয়ে গেল। তখন ওদিকে শীত পড়তে শুরু করেছে সবে। ওসব দিকে পুজোর পরই শীত এসে পড়ে, হেমন্তকাল বুঝতে বুঝতেই কখন যেন জব্বর শীত এসে যায়। সাসারামে শের শাহের সমাধি শুনেছি। গাড়ি যখন সাসারামে এসে পৌঁছল, তখন এত অন্ধকার যে আমার চোখে বাইরের কিছুই ধরা পড়ল না। এমন কী স্টেশনটাও যেন টিমটিম করছে।

সাসারাম থেকে গাড়ি ছাড়ার সময় একজন ভদ্রলোক এসে গাড়িতে উঠলেন। গায়ে লম্বা রেলের কোট, ওভারকোট ধরনের, রেলের প্যাণ্ট। গলায় একটা রুমাল জড়ানো। মাথায় বারান্দা মার্কা রেলের টুপি। মাথায় বেশ লম্বা।

ভদ্রলোক যখন উঠলেন, গাড়িটা তখন ছাড়ছিল। উনি ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কামরার বাতিগুলো দপ করে নিভে গেল। অবশ্য কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার জ্বলে উঠল।

লোকটিকে ভাল করে দেখাই যাচ্ছিল না। টুপিটা এমন করে নামানো যে, চোখের তলায় গিয়ে ঠেকেছে। সঙ্গে কোনো মালপত্রও নেই। ঝাড়া হাত-পা। উনি কামরায় উঠেই এদিক-সেদিক তাকিয়ে সোজা বাংকে উঠে শুয়ে পড়লেন। জুতো সমেত। শুয়ে পড়ে মাথার টুপিটা এমন করে মুখের ওপর চাপা দিলেন, মনে হল—কামরার আলো যেন চোখে না-লাগে সেই ব্যবস্থা করে নিলেন। যেটুকু দেখলাম ভদ্রলোককে, বুঝতে পারলাম রেলের লোক, আর অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। আমার বাবা রেলের চাকুরে। ছেলেবেলা থেকে রেলের লোক দেখতে দেখতে কেমন একটা আন্দাজ হয়ে গিয়েছে। গোমো আর ধানবাদে অজস্র অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান দেখেছি যারা রেলেই কাজ করে। ভদ্রলোকের কত

বয়েস তা ঠিক বুঝতে পারিনি, তবে আমার ছোট কাকার চেয়ে নিশ্চয় বড়।

গাড়ি চলতে শুরু করল। একটা বেঞ্চিতে আমরা—ঠাকুরমা, ছোটকাকা আর আমি। আর এক বেঞ্চিতে এক বিহারী ভদ্রলোক শুয়ে ছিলেন, তিনিও কাশী ফেরত, সঙ্গে বিস্তর মালপত্র। অন্য বেঞ্চিতে এক সাধুবাবা সঙ্গে তাঁর কোনো মারোয়াড়ী শিষ্য। সাধু-বাবার গায়ে গেরুয়া বস্ত্র, এইমাত্র—নয়ত তিনি একেবারে সাধারণ মানুষের মতন, হিন্দীতেই কথাবার্তা বলছিলেন।

আমার কাকা ট্রেনে উঠলেই ঢুলতে শুরু করেন। সন্ধে হয়েছে দেখে কাকাও মাথার ওপর বাংকে চড়ে বসলেন। গাড়ি চলতে লাগল। ঠাকুমা বোধ হয় জপতপ শুরু করলেন মনে মনে। আমি চুপচাপ একা। বাইরে তাকালেই অন্ধকার আর অন্ধকার। মাঝে মাঝে এঞ্জিনের ধোঁয়া এসে যেন নাকে লাগছে, কয়লার গুঁড়ো উড়ছে; আর থেকে থেকে ধোঁয়ার সঙ্গে আগুনের ফুলকি জোনাকির মতন অন্ধকারে ছিটকে পড়ছে।

এই ভাবে শোন নদী পেরিয়ে গেলাম। কী বড় ব্রীজ। ট্রেন ছুটছে, ছুটতে ছুটতে গয়াও এসে গেল, তখন রাত হয়ে গিয়েছে।

গয়া থেকে গাড়ি ছাড়ল। খাওয়া-দাওয়া শেষ আমাদের। কাকা আবার বাংকে উঠে ঘুম লাগালেন। বেহারী ভদ্রলোক খাওয়া শেষ করে ঢেঁকুর তুলতে লাগলেন বড় বড়। সাধুবাবা শিষ্যসমেত গয়ায় নেমে গেছেন। নতুন কেউ চড়েনি।

সেই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক কিন্তু একই ভাবে শুয়ে আছেন। ঘুমোচ্ছেন নিশ্চয়। ট্রেনে রেলের বহু লোকই যাতায়াত করে এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশন। কাজকর্মে যায়, কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরে, কাজেই ভদ্রলোক সম্পর্কে আমার কোনো কৌতূহল হয়নি।

গয়া আর কোডারমার মধ্যে—কোডারমার আগে—মস্ত

জঙ্গল। নামকরা জঙ্গল। বিহারে এত বড় জঙ্গল খুবই কম, লোকে বলে গুরপা গুঝাণ্ডির জঙ্গল। দিনের বেলাতেও এই জঙ্গলের অর্ধেক জায়গায় আলো রোদ ঢোকে না। রেল লাইন পাতার সময় এই জঙ্গলের আরও ভয়ঙ্কর চেহারা ছিল। রেলের কুলি লাইনের অনেকেই নাকি বাঘটাঘের পেটে গিয়েছে এখানে।

রেলের দুটো স্টেশনই আছে, গুরপা আর গুঝাণ্ডি। এই পাহাড়ী জায়গা-টুকুর চড়াই ভাঙতে বাড়তি একটা এঞ্জিন জুড়তে হয়, একটা এঞ্জিন গাড়ি টানতে পারে না।

আমার ঠিক মনে পড়ছে না কোডারমা থেকে গয়ার দিকে আসার সময়, না গয়া থেকে কোডারমার দিকে যাবার সময় দুটো এঞ্জিন লাগে। যখনই লাগুক তাতে এ গল্পের কোন ক্ষতি নেই। কেননা তখনকার দিনে বাড়তি এঞ্জিনটা একবার যেমন যেত অন্যবার ফিরে আসত। আবার যেত।

ডবল এঞ্জিন জুড়ে গাড়িটা ছাড়ল। রাতও হয়ে গিয়েছে। জঙ্গলের মুখে ঢুকে বেশ শীত-শীত লাগছিল। কাচের জানলাটা বন্ধ করে দিলাম। চারদিকে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার; গাছপালা আর অন্ধকার মিশে সে এক এমন জগৎ যা চোখে সওয়া যায় না বেশী-ক্ষণ। তবু গুরপা গুঝাণ্ডির আসল জঙ্গল তখনও শুরু হয়নি, তেমন নিবিড় নয় গাছপালা।

যেতে যেতে গাড়িটা হঠাৎ থেমে গেল।

সব রেলগাড়িই মাঝে-মাঝে বেজায়গায় থেমে যায়। হয় সিগন্যাল পায় না, না হয় অন্য কোনো গোলমাল হয়; কেন যে থামে যাত্রীরা তা বুঝতেও পারে না।

গাড়িটা থামার পর সামান্য সময় চুপচাপ কেটে গেল। ভাবছি, এই ছাড়বে। গাড়ি আর ছাড়ে না। হঠাৎ শুনি এঞ্জিনের হুইসেল বাজছে তারস্বরে। বাজছে তো বাজছেই।

বেহারী ভদ্রলোক জেগে ছিলেন, বললেন, 'লাইনের ওপর নিশ্চয় বাঘ বসে আছে। সরছে না।'

রেল লাইনের ওপর বাঘ বসে থাকে, এঞ্জিনের এত জোরালো আলোয় নড়ে না, শব্দতেও নয়— এ আমার জানা ছিল না।

আমার কাকাও বাংক থেকে নেমে এলেন।

ব্যাপারটা কী হচ্ছে বোঝার জন্যে জানলা খুলে দিলাম। দেখি গার্ডসাহেব হাতের সেই লাল সবুজ লণ্ঠন ঝুলিয়ে সামনের এঞ্জিনের দিকে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর সঙ্গে আরও দু একজন খালাসি ধরণের লোক—বোধ হয় পেছনের এঞ্জিনের। লাইনের পাশ দিয়েই যাচ্ছে সবাই।

আমাদের মতন আরও অনেকে গলা বাড়াচ্ছে কামরার মধ্যে থেকে। গাড়ির বাইরের দিকের আলো পড়েছে সামান্য, ভেতরের আলোও জানলা দিয়ে বাইরে পড়ছিল ঝাপসা ভাবে।

আমার কাকা আর বেহারী ভদ্রলোক নানা রকম কথা বলতে লাগলেন। ঠাকুমা একটু শুয়েছেন। সেই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক কিন্তু বাংকের ওপর পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছেন। টুপিতে মুখ ঢাকা।

গাড়ি আর ছাড়ে না।

ঠিক যে কতক্ষণ কাটল তাও বুঝতে পারলাম না। শেষে দেখি গাড়ির দরজা খুলে অনেকেই নামতে শুরু করেছে। নেমে যে যার কামরার পা-দানির কাছে দাঁড়িয়ে। নানা রকম গলা শোনা যাচ্ছে। জঙ্গলের মধ্যে কারও সাহস নেই দু পা এগিয়ে কিছু জেনে আসবে।

আমার কাকাও দরজা খুলে নিচে নামলেন।

আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল। কী যে হচ্ছিল তাও বুঝতে পারছিলাম না।

শেষ পর্যন্ত বেশ সোরগোল পড়ে গেল। কেমন করে যেন দু-চারটে

টর্চও বেরিয়ে গেল। লাইনে পাশ দিয়ে আসাযাওয়াও করতে লাগল কেউ কেউ।

গার্ড সাহেব শেষ পর্যন্ত ফিরতে লাগলেন। লোকে খোঁজ খবর নিচ্ছে, হল কী?

কাকা একটু এগিয়ে গিয়েছিলেন। খবর নিয়ে ফিরে এসে শুকনো মুখে বললেন, 'সামনে এঞ্জিনের ড্রাইভার মারা গিয়েছে হঠাৎ। নাক দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছিল। ফায়ারম্যানদের একজন গাড়ি থামিয়ে দিয়েছে।'

শুনে আমি চমকে উঠলাম।

বেহারী ভদ্রলোক বললেন, 'হায় ভগবান!'

মানুষ হঠাৎ কেমন করে মারা যায়, সে-বয়েসে বুঝতাম না। এখন বুঝি। তখন বুঝতে পারিনি ড্রাইভারের সেরিব্রাল স্ট্রোক হয়েছিল। তখন এ-সব রোগ-নিরোগের কথা শোনাও যেত না।

আগে রেল এঞ্জিনের মধ্যে ড্রাইভারের সঙ্গে কয়লা-দেওয়া জনা দুয়েক লোক ছাড়াও বোধ হয় একজন সাকরেদ থাকত ড্রাইভারের। এদেরই কেউ গাড়ি থামিয়ে দিয়েছে। দিয়ে ঘন ঘন হুইসল্ মেরে বিপদটা জানাচ্ছিল গার্ডকে।

এখন কী হবে? ড্রাইভার তো মারা গেল। গাড়ি চালাবে কে? আমরা কি সারা রাত এই জঙ্গলে পড়ে থাকব?

ড্রাইভার মারা গেছে এটা কোনো রকমে সব কামরায় প্রচার হয়ে পড়ল। তারপরই একটা হই-হই। বাইরে বড় কেউ নামছে না, পা-দানির তলায় দাঁড়িয়ে আছে। গলা বাড়াচ্ছে সবাই।

এমন সময় শোনা গেল, মৃত ড্রাইভারকে নামিয়ে ব্রেকভ্যানে তোলা হচ্ছে। এঞ্জিনের মধ্যে তো ফেলে রাখা যায় না।

দেখতে-দেখতে রাত বেড়েই চলল। আমরা অসহায়ের মতন গাড়িতে বসে আছি। ভাবছি, এই জঙ্গলে এইভাবেই সারাটা রাত কাটাতে হবে। না জানি কী হবে।

গার্ড সাহেবও বেশ চঞ্চল হয়ে পড়েছেন। কতবার যে সামনে দিয়ে আসা যাওয়া করলেন। তাঁরই তো যত ঝঞ্ঝাট ঝামেলা। এতগুলো যাত্রীর জীবন-মরণ যেন তাঁরই হাতে।

আরও খানিকটা পরে দেখি গার্ড সাহেব প্রত্যেকটি কামরার সামনে দাঁড়িয়ে কী যেন বলে দিচ্ছেন। বোধ হয় সাবধান করে দিচ্ছেন; বলছেন, যে যার কামরায় দরজা বন্ধ করে বসে থাকো, সকাল না হলে কিছু করার উপায় নেই।

আমাদের কামরার কাছে এলেন গার্ড সাহেব। আধ খোলা দরজা দিয়ে উঠলেন ভেতরে। লম্বা-চওড়া চেহারা, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান গার্ড। বললেন, 'আপনাদের সারারাত গাড়িতেই থাকতে হবে। সাবধানে থাকবেন। খুবই দুঃখের কথা, সামনের এঞ্জিনের ড্রাইভার হঠাৎ মারা গেছেন।'

গার্ড সাহেব নেমে যাবার একটু পরেই দেখি বাংক থেকে সেই অ্যাংলো ভদ্রলোক নেমে এলেন। টুপি পরলেন এমন করে যে মুখটা আড়াল হয়ে গেল। ভাল করেও দেখতে পেলাম না মুখটা।

ভদ্রলোক কামরা থেকেও নেমে গেলেন। তারপর দেখি পাশের কামরা থেকে গার্ড সাহেব নামামাত্র কী সব কথাবার্তা বলছেন।

সামান্য পরে দেখলাম গার্ড সাহেব আর সেই লোকটি সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

কাকা বললেন, 'যে মারা গেছে তার কেউ হবে।'

বেহারী ভদ্রলোক বললেন, 'মালুম, দোস্ত···।'

ঠাকুমা বললেন, 'দরজাটা বন্ধ করে দে।'

আমরা যখন দরজা বন্ধ করে, জানলার শার্সি ফেলে যে যার শোবার ব্যবস্থা করছি—তখন একেবারে আচমকা এঞ্জিনের হুইলে বেজে উঠল। বার তিন। টানা টানা। তারপরই গাড়ি আবার নড়ে উঠল।

সবাই অবাক।

কাকা বললেন, 'লোকটা নিশ্চয় ড্রাইভার। এ-লাইনে হরদম কত লোক আসা যাওয়া করে। যাক্ বাবা, বেঁচে গেলাম। কোডারমা তো পৌঁছই। এই জঙ্গলে সারা রাত পড়ে থাকতে হলে মরে যেতুম।'

বেহারী ভদ্রলোক বললেন, 'রামজী কী কৃপা, বাবু!'

গুরপা-গুঝাণ্ডির জঙ্গল পেরিয়ে আমরা কোডারমা পৌঁছলাম যখন তখন প্রায় মাঝ রাত।

স্টেশনে গাড়ি থামল।

হঠাৎ শুনি প্লাটফর্মে হই-হই।

জানালা দরজা খুলে নেমে গেল অনেকে। কাকাও নেমে গেলেন।

খানিকটা পরে ছুটতে-ছুটতে এসে বললেন, 'সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড। ওই যে লোকটা আমাদের কামরা থেকে নেমে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এল, সেই লোকটা যখন গাড়ি চালিয়ে আনছিল, তখন এঞ্জিনের ফায়ারম্যানরা বয়লারের আলোয় লোকটাকে পুরো দেখতে পেয়েছিল। একেবারে মরা ড্রাইভারের মুখের মতন দেখতে। সেই মরা ড্রাইভারই। গাড়ি থামামাত্রই ছুটো ফায়ারম্যানই এঞ্জিন থেকে নেমে পালিয়েছে। লোকটাকেও আর দেখা যাচ্ছে না।'

বেহারী ভদ্রলোক বললেন, 'হায় রাম!' বলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

আমি বললুম, 'আর গার্ড সাহেব?'

কাকা বললেন, 'গার্ড সাহেব ব্রেক ভ্যান খুলে ডেড্‌বডি নামাবার সময় মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন। বলছেন, 'মরা ড্রাইভার আর

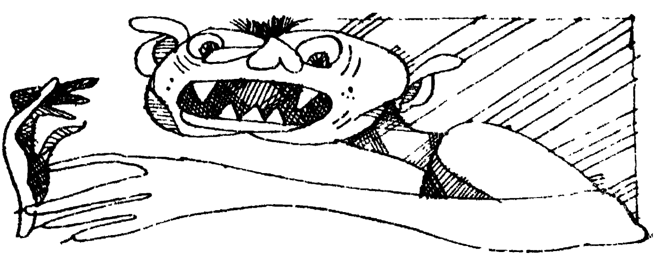
জ্যান্ত ড্রাইভারের কে যে সত্যি আর কে মিথ্যে—তিনি বুঝতে পারছেন না।'

আমার হাত-পা কাঁপছিল, গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে। আমি বললাম, 'তাহলে কে গাড়ি চালিয়ে আনল ?"

কাকা বললেন, 'আমিও তো তাই ভাবছি, ভূতে তো আর গাড়ি চালাতে পারে না ! কিন্তু ফায়ারম্যানরাই বা কেন পালাবে ? লোকটাই বা কেন উধাও হবে ? আশ্চর্য।'

আমার মনে পড়ল, সাসারাম স্টেশনে লোকটা ওঠামাত্র আমাদের আলো দপ্ করে নিভে গিয়েছিল।

কেন ?



উনুনে জ্বালাবার কাঠকুটো নেই বুঝি, সেই জন্য নিজের পা দু-খানা ঢুকিয়ে দিয়েছে উনুনের ভিতর, দাউ দাউ করে পা জ্বলছে

জামাই শ্বশুরবাড়ি গেলেন

মনোজ বসু

অনেক দিনের কথা। খুলনা অবধি নতুন রেল লাইন রয়েছে। একটা স্টেশন ঝিকরগাছি।

শ্রাবণ মাস। সারাদিন ঝুপঝুপ বৃষ্টি। সন্ধ্যা থেকে একটুখানি ধরেছে। রাত্রি সাড়ে আটটায় কলকাতার ট্রেন ঝিকরগাছি এসে থামল। দুর্যোগে মোটে ভিড় নেই। জন তিন-চার গাড়িতে উঠল। নামল একটি মাত্র যুবা পুরুষ। নাম বিনোদ। কাছাকাছি সাদিপুর গাঁয়ের মাখনলাল করের জামাই। তার ছোট মেয়ে চঞ্চলার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বছর দুই আগে।

পুণায় থাকে বিনোদ, মিলিটারীতে চাকরি করে। সম্প্রতি বাসা পেয়েছে। বউকে নতুন বাসায় নিয়ে যাবে। এক হপ্তার ছুটি নিয়ে শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছে। এরপর ভাদ্রমাস পড়ে যাবে। শ্বশুর-শাশুড়ি তখন মেয়ে পাঠাবেন না, সেইজন্য তাড়াতাড়ি।

স্টেশনে নেমে বিনোদ গেট পেরিয়ে বেরুল। গেটে লোক নেই, কেউ টিকিট চাইল না। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, কোনো দিকে জনমানব দেখা যায় না। আরও দু-বার সে শ্বশুর বাড়ি এসে গেছে, পথ মোটামুটি জানা। তবু ভাল করে একবার স্টেশন মাস্টারের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে নেবে।

অফিস ঘরের দরজা ঝাঁকাচ্ছেঃ মাস্টারমশায়, মাস্টারমশায়—

দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। আলো জ্বলছে। স্টেশন মাস্টার আছেন অতএব অফিসে। সাড়া দিচ্ছেন না।

শুনুন একবারটি মাস্টারমশায়—

পয়েণ্টসম্যান এলো হঠাৎ কোন দিক থেকে। গায়ে নীল কোট, তার উপর মোটা কম্বল জড়ানো। তা সত্ত্বেও হি-হি কাঁপছে। বলে, ডাকেন কেন বাবু? মাস্টার মশায় জ্বরে বেহুঁশ। গাড়ির ছাড় গার্ডসাহেব আজ আমার কাছ থেকে নিয়ে নিল। উনি উঠতে পারবেন না, আমায় বলুন কি দরকার।

সাদপুর থেকে আমার জন্য পালকি আসার কথা। দেখতে পাচ্ছিনে তো।

ভ্রূভঙ্গি করে পয়েণ্টসম্যান বলে, পালকি চাচ্ছেন বাবু, বলি পালকিটা বইবে কারা? বেয়ারা জুটবে কোথা? ম্যালেরিয়ার নতুন আমদানি —ঘরে ঘরে মেয়ে মদ্দ সকলের জ্বর। এক বাটি বার্লি রেঁধে দেবার মানুষ জোটে না, আপনার মাথায় পালকির শখ চাপল এখন!

হাঁসফাস করছিল লোকটা বিনোদের সামনে সেইখানে মেঝের উপর বসে পড়ল। বলে, আগের লোকটা—মারা গেল জ্বরে। পরশুদিন আমায় এই স্টেশনে পাঠাল। আমাকেও জ্বরে ধরেছে। কপালে কি আছে জানিনে!

দু-মাসের মধ্যে বিনোদ শ্বশুরবাড়ির কোন চিঠি পত্র পায়নি, মন বড় উতলা। স্টেশন মাস্টার পুরনো লোক। তিনি হয়তো খবরা-খবর কিছু বলতে পারতেন। এ লোক একেবারে নতুন, একে জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই।

সারাদিন খাওয়া হয়নি বিনোদের। বড় ক্লান্ত। একবার ভাবল রাত্রিটা স্টেশনে কাটিয়ে সকালবেলা বেরুবে। কিন্তু সামান্য পথ, মাইল তিনেকের বেশি নয়। মশা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়েছে— যা গতিক, রাতের মধ্যে চোখ বুঁজতে দেবে না। তার চেয়ে কোন

রকমে পথটুকু কাটিয়ে শ্বশুরবাড়ির খাটের উপর গদিয়ান হয়ে পড়া ভাল।

পথে নেমে পড়ল বিনোদ। হনহন করে চলছে। হাতঘড়িতে ন'টা। সন্ধ্যা-রাত্রি বলা যায়। এরই মধ্যে চারিদিকে নিশুতি। রাস্তার জল কল্‌কল্ করে নালায় পড়ছে। ব্যাঙ ডাকছে গ্যাঙর-গ্যাং। বাহুড়ের ঝাঁক উড়ছে মাথার উপরে।

চাঁদ দেখা দিল আকাশে। মেঘ-ভাঙা ঘোলাটে জ্যোৎস্না। অদূরে কেয়া ঝাড়। ছত্রাকার কেয়াপাতার নিচে মানুষ যেন। মানুষটা কাঁটা-বনের মোটা কেয়াগুড়ির উপর আরামে পা ছড়িয়ে বসে আছে। স্টেশন থেকে বেরিয়ে এতক্ষণের মধ্যে প্রথম মানুষ।

বিনোদ ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করে: সাদিপুরে মাখনলাল করের বাড়ি যাব। যাচ্ছি তো ঠিক?

উঁহু—। শঙ্খের মতন আওয়াজে মানুষটা জবাব দেয়: সাদিপুর যাবে তো এই দিকে চলে এসো।

আবার বলে, ডাকছি আসছ না কেন?

পথ কোথা গহন জঙ্গলের মধ্যে? পাগল নিশ্চয়—নয় তো রাত্রিবেলা ঘর বাড়ি ছেড়ে এমন জায়গায় কেন? মিলিটারি মানুষ বিনোদ—সে কিছু গ্রাহ্য করে না। নিরুত্তরে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে আরও জোরে গটমট করে চলল।

দীর্ঘ একটা খেজুর গাছ ঝড়ে বেঁকে গেছে। কাত হয়ে আছে সেটা রাস্তার উপর। গাছটা আগেও দেখেছে, বিনোদের মনে পড়ল। ঠিক পথেই যাচ্ছে তবে, পথ হারায়নি। যেই মাত্র গাছের নিচে আসা, গাছটা নুয়ে এসে বিষম জোরে মাটিতে আছড়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আবার আগেকার অবস্থায়—তেমনি কাত হয়ে আছে রাস্তার উপর। আর যেন খল্ খল্ হাসি শুনতে পায় বাতাসে। বিনোদ ছুটে বেরুল তাই রক্ষা। নইলে গাছ

ঠিক মাথার উপরে পড়ত, মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যেত। অল্পের জন্য বেঁচে গেছে।

খুব খানিকটা গিয়ে পিছনে তাকায়। খেজুর গাছ যেমন তেমনি আছে, পাতা ঝিলমিল করছে জ্যোৎস্নায়। সাহসী মানুষ বিনোদ—প্যারেড করে, বন্দুক চালায়। ভাবছে, চোখের ভুল। বম্বে মেল আজ বড্ড লেট ছিল হাওড়া স্টেশনে নেমেই শিয়ালদা মুখো ছুটতে হল। খাওয়া-দাওয়া হয়নি সমস্তটা দিন। ক্ষিদে-তেষ্টায় অবসন্ন হয়ে মাথা ঘুরছে, আর এই সমস্ত আজব জিনিস দেখছে। আসলে কিছুই নয়।

শ্বশুড়বাড়ি পৌঁছে গেল। অবস্থা ভাল এঁদের, পাকা কোঠা-বাড়ি। বৈঠকখানা অন্ধকার। শীতকালে বড়দিনের সময় বিনোদ এসেছিল, দিনরাত লোক গিজ গিজ করত তখন। রাত দুপুর অবধি পাশা খেলার হুল্লোড়। আজ কেউ নেই। সেটা হয় তো ঐ পয়েন্টম্যানের মুখে যা শোনা গেল—জ্বরজারির মধ্যে আড্ডা দেওয়ার পুলক নেই মানুষের। বাড়ির কর্তারাও হয় তো জ্বরের তাড়সে ভিতর-বাড়ির বিছানায় পড়ে কোঁ-কোঁ করছেন।

ভিতর-বাড়ির দরজাটা হা-হা করছে। জামাই ঢুকে গেল ভিতরে। বারান্দা দিয়ে যাচ্ছে শব্দ-সাড়া করে। কাশছে। একজন কেউ বেরিয়ে আসুক। কী আশ্চর্য! গেলেন কোথা সব?

এই রকম ভাবছে। কোন্ দিক থেকে ঘোমটা-দেওয়া এক বউ এসে সামনের উপর দাঁড়াল। বিনোদ হক চকিয়ে যায়। তাড়াতাড়ি পরিচয় দিল: এ বাড়ির ছোট জামাই আমি—বিনোদ।

খিল্‌খিল্ খিল্‌খিল্ উচ্ছলিত হাসি। হাসতে হাসতে ঘোমটা খুলে ফেলে চঞ্চলা, বিনোদের সঙ্গে এই মেয়ের বিয়ে হয়েছে।

চঞ্চলা আগে আগে চলেছে। মস্ত বড় বাড়ি। আরও কত বারান্দা, কত সিঁড়ি-উঠান পার হয়ে চলল। এক সময় বিনোদ সেই আগের প্রশ্ন করে, কাউকে দেখছিনে—গেলেন কোথা এঁরা সব?

চঞ্চলা বলে, ঝিকরগাছি আমার এক পিসির বাড়ি। পিসির মেয়ের বিয়ে আজ। বাড়িসুদ্ধ সেখানে চলে গেছেন।

একবার ঢোক গিলে বলে, আমারও যাবার কথা। কিন্তু জ্বর থেকে উঠে সবে অন্নপথ্য করেছি কিনা—

ঘরের মধ্যে এসে দু-জনে। কুলুঙ্গিতে প্রদীপ। প্রদীপের আলোয় বিনোদ চঞ্চলার দিকে ভাল করে তাকাল। অসুখ করেছিলো, চেহারায় তা বোঝা যায় না। আগে যেমন দেখে গেছে, তেমনি। চঞ্চলার চেহারা ও স্বাস্থ্য চমৎকার।

বিনোদ বলে, এত বড় বাড়ির মধ্যে একলা একটি প্রাণী—ভয় হচ্ছে না তোমার ?

একলা কেন হব ? বুড়ো দারোয়ান আর গোবিন্দ চাকর রয়েছে। তারা বৈঠকখানায়। সৌদামিনী ঝি-ও আছে। শরীর খারাপ বলে সকাল সকাল শুয়ে পড়েছে। ডাক দিলে এসে পড়বে।

পালঙ্কের বিছানায় চেপে বসে বিনোদ অভিমান ভরে বলে, আজ এসে পৌঁছব, স্টেশনে পালকি রাখবার জন্য চিঠি দিয়েছিলাম। পালকি না জুটুক, স্টেশনে অন্তত বুড়ো দারোয়ানকে পাঠালে পারতে।

চঞ্চলা ঘাড় নাড়ল : চিঠি পৌঁছয়নি, পৌঁছবার উপায় নেই। পোস্টমাস্টার পিওন দুটোই মারা গেছে। যে রানার ডাক বয়ে আনত, সে-ও নাকি নেই।

সাংঘাতিক ম্যালেরিয়া। জ্বরজারি কাকে বলে এ-অঞ্চলের লোক আগে জানত না। পাথরে-কোদা নিরেট দেহ যেন মানুষের। রেললাইন হয়ে অবধি এই রকম অবস্থা। গাঙ-খালের মুখ বন্ধ করে রাস্তা বেঁধেছে। খানাডোবা চারিদিকে। বর্ষার জল পড়তে না পড়তে নরক-গুলজার। মানুষজন উজাড় হয়ে গেল।

কথাবার্তার মধ্যে এক-সময় বিনোদ বলে, তোমার কাছে বলতে

কি—সারাদিন ভাত জোটেনি, বিষম ক্ষিধে পেয়েছে। চোখে মুখে আমার কথা সরছে না। তাড়াতাড়ি চাট্টি ভাত ফুটিয়ে দিতে পার তো দেখ।

চঞ্চলা ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ল : ছি-ছি, আগে বলতে হয়। চালে-ডালে খিচুড়ি চাপিয়ে দিইগে, তাড়াতাড়ি হবে। তরকারির হাঙ্গামায় যাব না। শুয়ে থাক তুমি, বিশ্রাম কর। এসে ডাকব তোমায়।

চলে গেল চঞ্চলা। যেন উড়ে বেরিয়ে গেল পাখির মতন।

এই ঘরটায় বিনোদ আগেও থেকে গেছে। পিছনে খিড়কির বাগান। কদম-ফুল ফুটেছে, খোলা জানালায় মিষ্টি গন্ধ আসছে। কুলুঙ্গির প্রদীপটা হঠাৎ দপ্‌দপ্‌ করে। আলো নাচে দেওয়ালে। চমক লাগে—অনেক লোকের আনাগোনা যেন বাইরে, ফিস্‌ ফিস্‌ কথাবার্তা।

কে রে, গোবিন্দ নাকি ওখানে?

জবাব নেই। একা গোবিন্দ কিংবা দু-জন চার জন মানুষ নয়। অনেক, অনেক। বাড়ির সকলে নিমন্ত্রণে গিয়েছে। এত লোক তবে কোথা থেকে আসে?

উঁকি দিয়ে দেখল জানালার বাইরে। জ্যোৎস্না উজ্জ্বল হয়েছে এখন। না, কিছুই নয়। কিন্তু যেই মাত্র ভিতর দিকে সরে আসে, আবার সেই পাতার খসখসানি। ভিড় জমেছে বুঝি জানালায়, ঠেলাঠেলি করে তারা উঁকি দিচ্ছে। চাপা গলায় শলাপরামর্শ।

উঠে গিয়ে বিনোদ দড়াম করে জানালার কপাট বন্ধ করল। একলা ঘরে গা-ছমছম করছে। চঞ্চলার কাছে একথা বলা যাবে না। হাসবে। ঠাট্টা করবে : এই বীরপুরুষ তুমি, এই সাহস নিয়ে পাঁয়তারা করে বেড়াও!

তার চেয়ে কোথায় চঞ্চলা রান্নাঘরে খিচুড়ি চাপিয়েছে—চলে

যাওয়া যাক সেখানে। রান্না চলবে আর গল্প হবে দু-জনায়।

পা টিপে টিপে নিঃসাড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ ঢুকে পড়ে চঞ্চলাকে চমকে দেবে।

কিন্তু—ওরে বাবা, কী সর্বনেশে কাণ্ড গো। রান্নাঘরে ঢুকতে গিয়ে বিনোদ পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। রান্না করছে চঞ্চলা, উনুনে জ্বালাবার কাঠকুটো নেই বুঝি, সেইজন্য নিজের পা দু-খানা ঢুকিয়ে দিয়েছে উনুনের ভিতর, দাউ দাউ করে পা জ্বলছে। উনুনের উপর কড়াইতে খিচুড়ি ফুটছে টগ্‌বগ্‌ করে। চঞ্চলা আঙুল দিয়ে এক একবার তুলে টিপে দেখছে সিদ্ধ হল কিনা। গরম খিচুড়ির মধ্যে ইচ্ছেমত আঙ্গুল দিচ্ছে। পা জ্বলছে ওদিকে উনুনের ভিতর।

মশলা বাটবে। কোণের দিকে শিল-নোড়া। চঞ্চলার উঠবার জো নেই—পা তুললেই তো নিভে যাবে উনুন। হাত বাড়াল শিল-নোড়া আনবার জন্য। হাত ক্রমে লম্বা হচ্ছে। লম্বা হয়ে শিল-নোড়া ধরল। তারপর ছোট হচ্ছে। হতে হতে আবার স্বাভাবিক আকারে এলো। কাছে এনে শিল পেতেছে। হাত লম্বা করে তখন তাকের উপরের মসলার ডালা নামিয়ে আনল। এক জায়গায় বসে সমস্ত হবে। ঘটর-ঘটর করে চঞ্চলা বাটনা বাটে এবার।

বিনোদ রুদ্ধনিশ্বাসে দেখে সব তাকিয়ে। পা দুটো খুঁটির মতন অনড় হয়ে আছে। দেখছে একদৃষ্টিতে।

খিচুড়ি নামিয়ে চঞ্চলা থালায় ঢালে। পিঁড়ি পেতে ঠাঁই করল। জলের গ্লাস দিল পাশে। পাতিলেবুর কথা মনে হল বুঝি এই সময়। জানলার গরাদ দিয়ে হাত বের করে দেয়। লম্বা হাত—আরও, আরও। হাত পঞ্চাশ তো হবেই। পাঁচিলের প্রান্তে পাতিলেবুর গাছ—বিনোদের দেখা আছে। ডান হাত সেই অবধি বাড়িয়ে পট পট করে গোটাচারেক লেবু ছিঁড়ে হাত আবার গুটিয়ে আনে। বঁটি পেতে লেবু কাটছে।

হঠাৎ বিনোদ যেন সংবিৎ পেয়ে যায়। উঠি-কি-পড়ি ছুটতে থাকে। শ্বশুরবাড়ির বাইরে, একেবারে রাস্তার উপর।

রাস্তা ধরে ছুটছে। মানুষ দেখা যায় না, কিন্তু চারদিক থেকে কলরব। বহুকণ্ঠে ডাকাডাকি করছে। পালাস কোথা? দাঁড়া। ভালর তরে বলছি, দাঁড়িয়ে যা—। খল্‌খল্‌ করে হাসে।

বাঁশতলায় অন্ধকার। ছুটতে ছুটতে অন্ধকার কাটিয়ে বিনোদ ফাঁকায় এল। কী আশ্চর্য! তার সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে চারদিকে চারটে বউ। সে যত ছোটে বউগুলোও ছোটে ততই। ছায়াকে যেমন ছেড়ে পালানো যায় না, তেমনি এরা।

সামনের বউটা একসময় থমকে দাঁড়ায়। গায়ের উপরে বিনোদ হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল, কোন রকমে সামলে নিল। রক্ষা নেই, এইবারে ধরল। তাকিয়ে দেখে, অন্য তিন বউ সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেছে।

সামনের বউটা ঘুরে দাঁড়ায় বিনোদের দিকে। এতক্ষণে মুখের ঘোমটা তুলল। তারই স্ত্রী চঞ্চলা—রান্না করছিল যে বসে বসে।

ডাইনে বাঁয়ে ও পিছনে মুখ ঘুরে দেখে, তারাও সব ঘোমটা খুলছে। চঞ্চলা সবাই। এক চঞ্চলা চারজন হয়ে গেছে। পালা-বার পথ নেই কোন দিকে। বিনোদের গায়ে ঘাম দেখা দিয়েছে। চারজনের আটখানা হাত অক্টোপাসের মত টুঁটি চেপে ধরে বুঝি এইবার। হাতগুলো সত্যি লম্বা হচ্ছে একটু করে, তার দিকে এগিয়ে আসছে। ফাঁকার মধ্যে বেঘোরে প্রাণটা গেল—হায় ভগবান!

চেতনা হারিয়ে বিনোদ পড়ে যায় আর কি পথের উপর। কিন্তু না—হাতের মুঠিতে গলা চেপে ধরে না, হাতের আঙুলের কোমল স্পর্শ তার দেহে। সর্বাঙ্গ জুড়িয়ে গেল।

চঞ্চলার চোখে জল, চারজনের একসঙ্গে চোখে জল এসে গেছে। চঞ্চলা বলে, দেখ আমি চারজন হয়ে চারদিক থেকে ঠেকিয়ে নিয়ে এলাম, নয় তো রক্ষা ছিল না। প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে দিত

না ওরা। বিনোদ বলে, ওরা কারা?

চঞ্চলা বললে, আমি মরে গেছি। আমার ভাই-বোন বাপ-মা সবাই। মহামারিতে এত বড় গাঁয়ের মধ্যে একটি প্রাণীও বেঁচে নেই। বেঁচে থাকতে এখানকার মানুষ গাঁয়ের মধ্যে চোর-ডাকাত ঢুকতে দিত না। মরার পরে তেমনি এখন জ্যান্ত মানুষ ঢুকতে দেয় না। কেউ ঢুকে পড়লে গলা টিপে মেরে দলের মধ্যে নিয়ে নেয়। তোমায় যে পারেনি, সে কেবল আমার জন্য। তুমি বেঁচে থাক, শতেক পরমায়ু হোক। এই কম বয়সে কেন তুমি মরতে যাবে।

হাঁপাচ্ছি ছোটাছুটির ক্লান্তিতে। চঞ্চলা খানিক দম নিয়ে বলে, গোড়ায় পিছু পিছু আসছিলাম। কিন্তু ভরসা হল না। সামনের দিক দিয়ে কিংবা ডাইনে বাঁয়ে কেউ এসে টপ করে যদি ধরে নেয়। একজনে চারজন হয়ে চতুর্দিকে ঘিরে নিয়ে এসেছি। সে যে কি কষ্ট! আর ভয় নেই, সাদিপুরের সীমানা ছাড়িয়ে এসেছি। একটুখানি গিয়েই স্টেশন।

চার বউ পাশ থেকে মাথা নুইয়ে চারখানা ডান হাত বের করে বিনোদের পায়ের ধুলো নিল। পলকের মধ্যে দেখে, ফাঁকা মাঠের মধ্যে একলা সে দাঁড়িয়ে। কোন দিকে কেউ নেই।



সেই আলোর ছটায় আবছা দেখলাম, কালো ঘোড়াটা জিনাকে নিয়ে হ্রদের জলে নেমে যাচ্ছে

কালো ঘোড়া

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

ব্যাপারটা নিছক স্বপ্ন, নাকি সত্যিসত্যি ঘটেছিল, বলা কঠিন। শুধু এটুকই বলতে পারি, এ-ঘটনা আমি মোটেও বানিয়ে বলছি না। যা-যা ঘটেছিল, অবিকল তাই-তাই বর্ণনা করছি।

গত শরৎকালের কথা। তখন আমি মার্কিন মুলুকের কান্ট্রি এলাকা অর্থাৎ পাড়াগাঁয়ে এক ভদ্রলোকের অতিথি হয়ে আছি। ভদ্রলোকের নাম ডঃ হেরম্যান জুট্রাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে আগে জার্মানিতে হিটলারের চেলারা ইহুদিদের ওপর অত্যাচার শুরু করলে ডঃ জুট্রাম আমেরিকায় পালিয়ে আসেন। কারণ উনি ইহুদি।

এলাকার নাম মুনভিলে। মানে করলে হয়তো দাঁড়ায় চন্দ্রপুরী। আসলে নিঃঝুম কয়েকটা বনে-ঢাকা ছোট্ট টিলার ওপর একটা করে বাড়ি। হাইওয়ে থেকে কষ্টেসৃষ্টে তাকালে নজর পড়ে। চারিদিকে ছড়ানো ঢেউ খেলানো মাঠ। কোথাও ধূসর হয়ে ওঠা ভুট্টাখেত। কোথাও গোরু, শুয়োর বা ঘোড়ার বাথান—চারিদিক কাঠের বেড়ায় ঘেরা।

মুনভিলে নাম কেন?

ডঃ জুট্রাম আমার প্রশ্ন শুনে বলেছিলেন, 'ওই যে নিচের দিকে হ্রদটা দেখছ, ওটার গড়ন লক্ষ্য করো।'

বাড়ির পুবে টিলাটা ফাঁকা এবং ঢালু হয়ে নেমে গেছে। তারপর হ্রদ। পুবের ঘাসে-ঢাকা লন ও ফুলবাগিচায় দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলছিলাম। দেখলাম, হ্রদটা অর্ধবৃত্তাকার। তার মানে অবিকল চন্দ্রকলার মতো। বলেছিলাম, 'হ্রদটার নাম হওয়া উচিত মুন লেক!'

'ঠিকই ধরেছ।' ডঃ জুট্রাম হেসে উঠেছিলেন। 'ওটার নাম মুন লেক। তবে তার চেয়েও সুখের কথা, মুন লেকের ধারে জ্যোৎস্না রাতে গিয়ে ঘোরাঘুরি করলে তুমি রূপকথার রাজপুত্তুরটি হয়ে উঠবে।'

হাসতে হাসতে বলেছিলাম, 'কিন্তু রাজপুত্তুরের যে একটা ঘোড়াও চাই। যেমন তেমন ঘোড়া চলবে না, চাই একটি পক্ষিরাজ, সেই যে যাদের ডানা আছে……।'

বলতে বলতে একটু অবাক হয়ে থেমেছিলাম। ডঃ জুট্রামের লালচে মুখে হঠাৎ কেন অমন গাঢ় ছায়া—যেন হঠাৎ কি অসুখ বাঁধিয়ে বসেছেন। ঠোঁট দুটো কাঁপছে। চোখ নিষ্পলক।

ব্যস্ত হয়ে বলেছিলাম, 'আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন, ডঃ জুট্রাম?'

উনি তখনই ঘুম থেকে জেগে ওঠার মতো কাঁধ দুটো নাড়া দিয়ে আগের হাসিটা ফিরিয়ে এনেছিলেন। …'হ্যাঁ, তুমি ঘোড়ার কথা বলেছিলে। তাই না?'

'হ্যাঁ, ডঃ জুট্রাম।'

'জানো? মুন লেকের অদ্ভুত অদ্ভুত সব গল্প আছে। তার মধ্যে ওই ঘোড়ার গল্পটা সাংঘাতিক। মাঝে মাঝে—বিশেষ করে জ্যোৎস্নার রাতে নাকি হ্রদের জল থেকে একটা কালো ঘোড়া উঠে আসে। ঘোড়াটা নাকি প্রাচীন যুগের এক রেড ইণ্ডিয়ান সর্দারের। নিছক ভুতুড়ে ব্যাপার।'……

বলে ডঃ জুট্রাম হাতঘড়িটা দেখে নিলেন এবং ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।...'কী কাণ্ড। আমাকে যে এক্ষুনি শহরে দৌড়ুতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা সেমিনার আছে। তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে?'

ডঃ জুট্রাম পা বাড়িয়ে ফের বললেন, 'থাক গে, তোমার গিয়ে কাজ নেই। পণ্ডিতী কচকচি তোমার ভাল লাগবে না। তার চেয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করো। আয়ু বাড়বে।'

হাসতে হাসতে চলে গিয়েছিলেন ডঃ জুট্রাম। একটু পরে বাড়ির দক্ষিণে বনের গড়ানে রাস্তায় ওঁর সাদা গাড়িটা নেমে যেতে দেখেছিলাম। তখন বেলা প্রায় সাড়ে-তিনটে। টিলার মাথায় কাঠের দোতলা বাড়িটা আরও নিঃঝুম হয়ে গেল। গাছপালা থেকে ঝিঁঝিঁ পোকার বিকট হাঁকডাক শোনা যাচ্ছিল। মার্কিন ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক বড্ড বিরক্তিকর। মনে মনে খাপ্পা হয়ে বললাম, রোসো বাছাধনরা! ফল অর্থাৎ পাতা ঝরার দিন শুরু হলেই তোমাদের বীরত্ব কোথায় থাকে, দেখা যাবে।

ডঃ জুট্রামের প্রকাণ্ড কুকুরটার নাম রেক্স। একে কুকুরকে আমার প্রচণ্ড ভয়, তাতে রেক্স আমাকে যতবার দেখে, মাতৃভাষায় গালা-গালি করে। বাঁধা না থাকলে আমাকে নিশ্চয় সোজা ভারতে ফেরত পাঠিয়ে ছাড়ত। কাঁচুমাচু মুখে ডঃ জুট্রাম বলেছিলেন, রেক্সের এই এক দোষ। বিদেশী দেখতে পারে না।

হাই তুলে ভয়ে-ভয়ে বারান্দায় উঠলাম। কিন্তু রেক্সের সাড়া পেলাম না। তখন দরজা খুলে বসার ঘরের ভেতর উঁকি দিলাম। সিঁড়ির পাশে কুকুরটা থাকে। সেখানে নেই। তাহলে জুট্রামের সঙ্গে লেকচার শুনতে গেছে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

দোতলায় আমার ঘর। বেলা ছুটোয় লাঞ্চ খেয়েছি। বাঙালি স্বভাবে ভাতঘুম নামে আরামদায়ক একটা ব্যাপার আছে। সায়েবদের সংসর্গে সেটা বরবাদ হতে বসেছে। আজ এমন সুযোগ

ছাড়া যায় না। অতএব সটান বিছানায় চিৎ হলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যে বন্ধুবর ভাতঘুম এসে কোলাকুলি করলেন। তখন আঃ, কী আনন্দ। কতদিন পরে দেখা।

কতক্ষণ পরে কার ডাকাডাকিতে চোখ খুলতে হল। তাকিয়ে দেখি, বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে আট ন' বছরের একটা মেয়ে। গোলগাল পুতুল-গড়ন। একমাথা ঝাঁকড়মাকড় সোনালী চুল। পরনে উজ্জ্বল নীল ফ্রক। গলায় সাদা স্কার্ফ জড়ানো। মেয়েটা অবাক চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

তখুনি মনে পড়ে গেল, আরে তাই তো! এরই ছবি বাড়ির ওপরে-নিচে সব ঘরে দেখেছি। ওই তো এ-ঘরের দেওয়ালেও রয়েছে। ডাঃ জুট্রামকে জিজ্ঞেস করব ভেবেছিলাম। ভুলে গেছি।

উঠে বসে মিষ্টি হেসে বললাম, 'হাই!'

আমার মার্কিন সম্ভাষণের জবাবে ছোট্ট করে বলল, 'হাই!' কিন্তু মুখের অবাক ভাবটা ঘুচল না। ঠোঁট কামড়ে ঘরের ভেতর দেখে নিয়ে হঠাৎ একটু হাসল। হেসে বলল, 'তুমি নিশ্চয় বাবার অতিথি। তুমি কি বিদেশী?'

সায় দিয়ে বললাম, 'প্রথমে তোমার নাম বলো।'

'জিনা!'

'তুমি নিশ্চয় শহর থেকে পড়াশুনো করো, তাই না জিনা?' ওর সঙ্গে খাতির জমাতে বসলাম। 'তা এলে কার সঙ্গে? মায়ের সঙ্গে বুঝি। চলো, তোমার মায়ের সঙ্গে আলাপ করি।'

ডঃ জুট্রাম তাঁর স্ত্রী কিংবা মেয়ের কথা কিছু বলেননি। আমিও কিছু জানতে চাইনি। কারুর ব্যাক্তিগত ব্যাপার জানতে চাওয়া ভদ্রতাসম্মত নয়।

উঠে দাঁড়িয়েছি, জিনা বলল, 'তুমি বললে না কোন দেশের লোক?'

'আমি ইণ্ডিয়ান।'

শুনেই জিনা যেন চমকে উঠল। বলল, তুমি ইণ্ডিয়ান কিন্তু…'

'কিন্তু, কী বলো তো জিনা ?'

'তোমার মাথায় পালকের টুপি নেই। গলায় রঙিন পাথরের মালা নেই।' জিনা বলতে থাকল। 'তোমার বর্শা কী হল। তোমার চুল কেটে ফেলছ কেন? তুমি এমন বেঁটে মানুষ কেন ?'

ওকে থামিয়ে হাসতে হাসতে বললাম, 'জিনা, জিনা! আমাকে বলতে দাও। ইণ্ডিয়ান মানে আমি ইণ্ডিয়া—ভারতের লোক। তুমি আমাকে রেড ইণ্ডিয়ান ভেবেছ দেখছি। ভারতের নাম শোননি ? পুবের দেশ।'

জিনা কেমন যেন নিরাশ গলায় বলল, 'ও! তুমি ওরিয়েণ্টাল।'

'ঠিক বলেছ। এবার চলো, তোমার মায়ের সঙ্গে আলাপ করি।'

জিনা সে-কথায় কান না দিয়ে বলল, 'তুমি আমার সঙ্গে বাস্কেট বল খেলবে ?'

'খেলব বৈকি।'

'এসো।' বলে সে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকল। তার পেছন-পেছন নেমে নিচের ঘরে কাউকেও দেখতে পেলাম না। ঘরের ভেতর ততক্ষণে হালকা আঁধার জমেছে। পুবের বারান্দায় বেরিয়ে দেখি, বেলা পড়ে গেছে। নীলচে কুয়াশা জড়িয়ে রয়েছে গাছ-পালার মাথায়। আকাশে উড়ে যাচ্ছে বুনো হাঁসের ঝাঁক। নিচের দিকে একটু দূরে মুন লেকের জলে তখনও লালচে ছটা ছড়িয়ে আছে।

'হেই! এখানে চলে এসো।'

ঘুরে দেখি লনের কোনায় বাস্কেট বল নিয়ে জিনা দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে খেলায় মেতে গেলাম। মেয়েটি বড় চঞ্চল প্রকৃতির। আমার আনাড়িপনায় খিলখিল করে হেসে উঠছিল। আমাকে গোহারা করে হারিয়ে ছাড়ল। আবছা আঁধার হয়ে

এলে বললাম, 'এই যথেষ্ট। সকালে আবার হবে। তখন তোমায় হারিয়ে দেব।'

জিনা লেকের দিকে তাকিয়ে আছে। কেমন যেন আনমনা।

বললাম, 'জানো জিনা? অবিকল তোমার মত আমার একটি মেয়ে আছে। তার নাম কী জানো? নিনা। তোমরা দুজনে পেনফ্রেণ্ড হতে পারো।'

আনমনা জিনা বলল, 'আই লাইক হার।' তারপর হঠাৎ পা বাড়াল। 'আমার সঙ্গে লেকে যাবে? তোমাকে একটা জিনিস দেখাব। ভারি মজার। এসো না।'

সে গেট খুলে ঢালু সবুজ ঘাসে ঢাকা জমি দিয়ে দৌড়ুতে শুরু করল। চেঁচিয়ে বললাম, 'জিনা, আস্তে আস্তে। দৌড়িও না, আছাড় খাবে।'

ততক্ষণে সে লেকের বালির চওড়া বীচে পৌঁছে গেছে। আমার যেতে বেশ খানিকটা সময় লাগল। বীচে পৌঁছে টের পেলাম কনকনে ঠাণ্ডায় রক্ত জমতে শুরু করেছে। মেয়েটা কিন্তু দিব্যি ছোটাছুটি করছে বালিতে। হঠাৎ চোখ গেল হ্রদের ওপারে টিলার মাথায়। বাঁকা এক টুকরো চাঁদ উঠছে। তখুনি ডঃ জুট্রামের গল্পটা মনে পড়ল। কেমন অস্বস্তি জাগল। বললাম, 'জিনা! এবার ফেরা যাক।'

জিনা জবাব দিল না। জলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। সেই সময় হু-হু করে একটা বাতাস এল। ঠাণ্ডাটা বেড়ে গেল। ঠকঠক করে কাঁপতে থাকলাম। কী শীত, কী শীত! দস্যি মেয়েটার পাল্লায় পড়ে শেষ অব্দি না নিমুনিয়া বাধাই।

হ্রদের জলটা কাঁপছে। আবছা জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছে সারা হ্রদ। তারপর একসঙ্গে অসংখ্য বুনো হাঁস প্যাঁক-প্যাঁক করে ডেকে উঠল। তারপর যা দেখলাম, সারা শরীর অবশ হয়ে গেল।

শীতের কথা ভুলে গেলাম। হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। স্বপ্ন দেখছি না তো ?

যেন জলের ওপর দিয়েই হেঁটে এল একটা কালো ঘোড়া। হ্যাঁ, জলজ্যান্ত একটা কালো ঘোড়া।

ঘোড়াটা বীচে আসতেই জিনা কী দুর্বোধ্য শব্দে চেঁচিয়ে উঠল। তারপর দেখি, কালো ঘোড়াটার সঙ্গে সে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। কখনও আমার সামনে দিয়ে কখনও পিছন দিয়ে দুজনে ছোটা-ছুটি করতে থাকল। ঘোড়াটা আমার উপর এসে পড়বে ভেবে আমি আতঙ্কে কাঠ। কিন্তু গলায় কী আটকে গেছে। জিনাকে বারণ করার সাধ্যও নেই।

একটু পরে দেখলাম, জিনা কালো ঘোড়াটার ওপর চেপে বসেছে। ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় সাবা বীচ জুড়ে খালি ঘোড়ার পায়ের শব্দ।

তারপর পেছনে উপর দিক থেকে কেউ আমার নাম ধরে ডাকছে শুনলাম। সেই সঙ্গে কুকুরের গর্জনও শুনতে পেলাম। টর্চের আলো ছড়িয়ে পড়ল আমার গায়ের ওপর। সেই আলোর ছটায় আবছা দেখলাম, কালো ঘোড়াটা জিনাকে নিয়ে হ্রদের জলে নেমে যাচ্ছে। এতক্ষণে গলা দিয়ে স্বর বেরুল। চেঁচিয়ে উঠলাম, 'জিনা জিনা !'

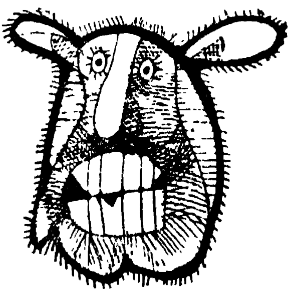
পেছনে ডঃ জুট্রাম বাগর্থাই চেঁচিয়ে বললেন, 'কাম ব্যাক ! কাম ব্যাক, ইউ ফুল।'

তারপর আমার হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন। রেক্স জলের ধারে দাঁড়িয়ে তখনও গরগর করছে।

ঘণ্টাখানেক পরে ফায়ার প্লেসের সামনে দু'জনে চুপচাপ বসে আছি। এক সময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে জুট্রাম বললেন, 'তুমি জিনা জিনা বলে ডাকছিলে। তুমি কি ওকে সত্যিই দেখেছিলে ? পরনে নীল ফ্রক, গলায় সাদা স্কার্ফ ছিল। তাই না ?'

'হ্যাঁ, আর সেই কালো ঘোড়াটাও!'

কথা কেড়ে নিয়ে ডঃ জুট্রাম বললেন, 'দশ বছর আগে জিনা মুন্ লেকে ডুবে মরেছে। তার এক বছর পরে ওর মা রোগে ভুগে মারা যায়। আমিও মুনভিলেতে মরতে চাই। তাই এখানে একা পড়ে আছি। বলতে পারো, ওয়েটিং ফর দি ব্লাক হর্স।'



তাহার দৃষ্টিতে মায়া, হাসিতে মায়া, ভাষা-ভঙ্গিতে মায়া। মঞ্চে আলেয়ার মত সে নাচিয়া বেড়াইতেছে, একজনকেই পথ ভুলানো তাহার উদ্দেশ্য

রঙ্গভূমিকা

আনন্দ বাগচী

[গল্পটি আমার লেখা নয়। তবে আমার সংগ্রহ। একজন প্রখ্যাত-রঙ্গমঞ্চ-অভিনেতার ডায়েরিতে গল্পটি পাওয়া গিয়েছিল। উনিশ-শতকের লোক তিনি। বিশ-শতকের গোড়ার দিকে তাঁর নাম করলে শুধু কলকাতা শহরের কেন, গোটা বাংলাদেশের লোকই চিনতে পারত। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর জন্য নয়, তাঁর অভিনয় নৈপুণ্য, ব্যক্তিত্ব এবং অনন্যসাধারণ চেহারার জন্যেই তিনি বাংলা-দেশের প্রিয় অভিনেতা ছিলেন। ডায়েরিটার খোঁজ বহুকাল পরে পাওয়া গেল, না হলে, তাঁর তৎকালীন রহস্যময় মৃত্যুর ওপরে যে যবনিকাপাত হয়েছিল, সংবাদপত্রগুলিতে যে উদভ্রান্ত আলোচনা এবং অনুমান প্রকাশিত হয়েছিল, তার ওপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত হত বলে আমার বিশ্বাস।

ডায়েরিতে দিন প্রতিদিনের ঘটনাপঞ্জী এবং মনোভাব লিখিত হয়েছিল। খুব প্রকৃতিস্থ হাতে লেখা নয়। মদ্যপানের ফলেই হোক, অথবা সে সময়ে তাঁর মানসিক অবস্থা খুব বিচলিত ছিল বলেই হোক, তাঁর জবানবন্দী একটু বিশৃঙ্খল ভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। আমার সাধ্যমত আমি তাঁর অসংলগ্ন দিনবিবরণীকে একত্রিত করে গল্পের আকৃতি দিয়েছি এবং ভাষার কিছুটা সংমার্জনা করেছি। বেদনাদায়ক অতীতের পুনরুদ্‌ঘাটন সুখকর নয়। তাছাড়া সেই

অভিনেতার আত্মীয়বর্গের কেউ কেউ এখনো জীবিত আছেন, এমন খবর পেয়েছি। সে কারণে তাঁর নাম ও সংশ্লিষ্ট রঙ্গালয়ের নাম গোপন রাখতে বাধ্য হলাম। গল্পটি সেই অভিনেতার কণ্ঠস্বরেই আপনারা পড়বেন। গল্পের 'আমি' এবং এই ভূমিকার আমি এক লোক নই।]

এই থিয়েটার হলের নাম 'জতুগৃহ' কে রাখিয়াছিল জানি না, তবে তাহার রসবোধ ছিল। বার কয়েক টিমটিম করিয়া নিস্তেজ প্রদীপের মত জতুগৃহ একদিন একেবারে নিভিয়া গিয়াছিল, তারপরে অভিনয় আর শুরু হয় নাই। অনেক আকাঙ্ক্ষা এবং সম্ভাবনা লইয়াই একদিন এই বিরাট চৌহদ্দি বেষ্টিত নাট্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কারণ বাংলাদেশে তখন পেশাদার অভিনয়ের জোয়ার আসিয়াছিল। নামকরা অভিনেতা অভিনেত্রী লইয়া জতুগৃহের উদ্বোধন যখন হয়, তখন আমি সদ্য-গোঁফ কামানো কিশোর, ছোটখাটো টুকরা পার্ট পাইয়া এখানে সেখানে কৃতার্থ হইয়া বেড়াইতেছি মাত্র। তখনই জতুগৃহ জমজমাট, সারা শহরে টনক নড়াইয়া সেখানে অভিনয় হয়। প্রতি অভিনয় রজনীতে শহরের গণ্যমান্য অতিথি অভ্যাগতরা উপস্থিত থাকেন, জুড়িগাড়িতে নাট্যালয়ের উদ্যান এবং সম্মুখবর্তী রাজপথ ভরিয়া যায়। সম্ভ্রান্ত বনেদী পরিবারের মহিলারা অলঙ্কার বেশবিন্যাশের ঝিলিক তুলিয়া এই অঞ্চল মুখর করিয়া তোলেন। পরদিন শহরের দৈনিক কাগজগুলিতে অভিনয় প্রসঙ্গে বেশ বড় সড় হেডলাইন পড়িয়া যায়। আমার মত ফালতু অভিনেতারা তো বটেই, অনেক প্রতিষ্ঠিত নায়ক-নায়িকাও লুব্ধচিত্তে জতুগৃহ-কর্তৃপক্ষের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন, কবে তাঁহাদের ডাক পড়িবে।

কিন্তু ভাগ্য কখন কাহাকে লইয়া খেলা করে বলা যায় না। জতুগৃহ নামটি একদিন ব্যঙ্গ অর্থে ফলিয়া গেল। সত্য সত্যই

আগুন লাগিয়া জতুগৃহ রঙ্গমঞ্চ প্রায় ভস্মীভূত হইয়া গেল। জতুগৃহের পতন হইল। অগ্নিকাণ্ডটি মারাত্মক হইয়াছিল তাহাই নয়, একটু রহস্যেরও গন্ধ ছিল। শোনা যায়, লেডিস গ্রীনরুমের দিক হইতেই আগুন ছড়াইয়াছিল। অবশ্য সচরাচর আগুন জিনিসটি ঐ ঈশান কোণ হইতেই আসিয়া থাকে।

ইহার পর বার দুই হাত বদল হইয়া পুনরায় অভিনয় পর্ব আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু আর জমিয়া ওঠে নাই। নায়িকার অপমৃত্যু-কথা কি করিয়া নানাবিধ কিম্ভূতকিমাকার কাহিনীর সহিত জড়াইয়া দর্শক মহলে ভাবান্তর আনিয়া দিয়াছিল।

জতুগৃহ নামটি এবং তাহার উত্থান-পতনের এই রোমাঞ্চকর ইতিহাসটি আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। তাই দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে, যখন কলিকাতার প্রাচীরে প্রাচীরে আমি অন্যতম সচিত্র পুরুষ হিসাবে বিরাজ করিতেছি, যখন যে কোন রঙ্গালয় আমাকে নটপ্রধান হিসাবে পাইলে কৃতার্থ হইয়া যায়, তখন আমার মাথায় এই পুরাতনের ভূত চাপিল। এই পোড়ো অট্টালিকাটির সংস্কার করিয়া আমি নিজে একটি নাট্যসম্প্রদায় পরিচালনার প্রয়োজন অনুভব করিলাম। ভাগ্যগুণে এখন আমার কেবল প্রভূত যশ নয়, প্রভূত অর্থও। যে কিশোরটি একদিন ছোটখাটো ভালমন্দ যে কোন একটি টুকরা পার্টের জন্য পরিচালকের দুয়ারে দুয়ারে ধর্না দিয়া বেড়াইয়াছে, তাহাকে আমি কিছুতেই ভুলিতে পারি নাই। অভিনয়ার্থী সেই যুবকের আত্মাভিমান আমাকে এই যশের শিখরে পর্যন্ত তাড়া করিয়া আসিয়াছে। তাই মনস্থির করিয়া আমি এবং আমার বন্ধু হরিকিশোর শেঠ যৌথভাবে জতুগৃহ লীজ নিলাম। প্রায় নামমাত্র মূল্যে দীর্ঘমেয়াদী লীজ।

পরিচিতেরা ব্যাপারখানা শুনিয়া হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিলেন

এবং এই অদ্ভুত ইচ্ছা হইতে বিরত হইতে অনেক অনুরোধ করিলেন। কেহ কেহ ভূতুড়ে বাড়ি পর্যন্ত বলিতে ইতস্তত করিলেন না। কোন কোন ভাগ্যবাদীর মতে ওটি অভিশপ্ত পীঠস্থান, ওখানে বারবার তিন বার ভাগ্যের পরীক্ষা এবং বিসর্জন দুইই হইয়া গিয়াছে। আবার কেন?

নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকিয়া সংক্ষেপে সারিলাম। বলিলাম, 'অঙ্কশাস্ত্রে তিন পর্যন্তই সংখ্যার দৌড় নয়, সেখানে চারও আছে।' আর ভূতবাদীদের স্মিতহাস্যে বলিলাম, 'একেই বলে সুখে থাকতে ভূতে কিলোনো, বুঝেছ?' তাহারা কি বুঝিয়াছিলেন জানি না, তবে আমি আজ হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি।

জতুগৃহের দ্বিতলে কমন রিহার্সাল-রুমে আমাদের নব আয়োজিত নাটকের মহড়া চলিয়াছে। প্রম্পটার বাঁড়ুয্যে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ভগ্নদূতের মত প্রবেশ করিল, 'বনানীবালা ওদের দলে যোগ দিয়েছে স্যার।'

সকলের চক্ষুস্থির হইয়া গেল। বনানীবালা ছিল আমাদের বর্তমান নাটকের নায়িকা। মাত্র পাঁচ রজনী সে জতুগৃহে অভিনয় করিয়াছে, কিন্তু এই পাঁচ দিনের অভিনয়েই সে খবরের কাগজ-ওয়ালাদের পঞ্চমুখ প্রশংসা পাইয়াছে। আমি প্রতিভা চিনি. আমার সম্প্রদায়ের নামকরণও করিয়াছি, 'নবনাট্য প্রতিভা'! জানিতাম রূপের জন্য নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেমন হয়, বনানীবালা অল্পকালের মধ্যেই রঙ্গমঞ্চের তারকা হইয়া উঠিবে। তাহার মধ্যে শুধু পার্টস নাই, প্রতিভাও আছে।

কয়েকদিন অসুস্থতার অজুহাতে রিহার্সালে আসিতেছিল না, আজ বাঁড়ুয্যে বনানীবালা-রহস্য পরিষ্কার করিয়া দিল। বাঁড়ুয্যে প্রম্পটার হইলেও কাজে আমার দক্ষিণ হস্ত, সে আমার ইনফর্মারও

বটে। ত্রিশ বছর এই দুটি কাজেই সে চুল পাকাইয়াছে। অভিনেতার অভাব বাংলাদেশে আজ নাই, কোনদিনও ছিল না। কিন্তু অভিনেত্রী, কিঞ্চিৎ শিক্ষিত ভদ্রঘরের অভিনেত্রী এখনো বাংলাদেশে দুষ্প্রাপ্য। অন্নাভাব বস্ত্রাভাব এবং কোন দুর্ঘটনা না ঘটিলে বাংলাদেশের মেয়েরা কিছুতে ঘরের বাহির হয় না। বাঁড়ুয্যে কলিকাতা শহরের তাবৎ অভাবগ্রস্ত মেয়েদের নাড়ি-নক্ষত্রের খবর রাখে। বয়স তাহার ষাটের কোলে, কিন্তু এখনো সে অকৃতদার কেন কিঞ্চিৎ অনুমান করা যায়। সে যাহাই হউক, বাঁড়ুয্যেকে আমি স্নেহ করি, দ্বিগুণ বেতনে তাহাকে আমি আমাদের থিয়েটারে নিযুক্ত করিয়াছি। বনানীবালার খবরে সত্যই দমিয়া গেলাম। যদিও নায়িকার স্থান পূরণের মত অভিনেত্রী আমাদের হাতে ছিল, তবু ইহা প্রেস্টিজের ব্যাপার। কুলবধূর কুলত্যাগের মতই, পঞ্চম রজনীতেই চরিত্রপতন হইলে পরিচালকের মুখ থাকে না। আমার এবং আমার শিষ্যদের অভিনয়ের গুণে ক্ষতিপূরণ একপ্রকার হইয়া যাইবে, কিন্তু বনানীবালার বদলে অন্য কোন বালার প্রকাশ্য অভিনয়ে দুর্মুখদের ঠেকাইব কি করিয়া। তাহা ছাড়া গোলাদর্শক, যাহারা শুধুমাত্র নায়িকা দেখিতেই আসে, অভিনয়ে কিছু যায় আসে না, তাহাদের চোখ ভরাইব কি দিয়া!

স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম্! এই আশ্চর্য ব্যাপারটা কিছুতেই বুঝিতে পারি না, যেখানে তাহারা যত সুখশান্তি-সমীহ পায়, সেখানেই তাহাদের মন টেকে না। বনানীবালা 'নবনাট্য প্রতিভা'র কাছে যে ব্যবহার ও সুখ-সুবিধা পাইতেছিল এবং পাইত, আমি দীর্ঘ-জীবনের অভিজ্ঞতায় হলফ করিয়া বলিতে পারি, তাহার সিকি ভাগও কোথাও পাইবে না। আকস্মিক লোভে সে তাহার যোগ্যস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইল, ভবিষ্যতে অনেক অমর্যাদা এবং অর্থকষ্ট তাহার বরাতে আছে।

বাঁড়ুয্যে উত্তেজিত গলায় বলিল, 'নিশ্চয়ই কেউ ফুসলেছে

স্যার, মেয়েটি কিন্তু তেমন ছিল না। পচে মবতে হবে এর পরে···'

বলিলাম, 'তুমি চুপ করো বাঁড়ুয্যে, খেলা দেখে যাও, নাট্যশালা খুলেছ আর নাটক দেখবে না!'

কয়েকদিন যাইতে না যাইতেই বুঝিলাম, আমার একটি রীতিমত শত্রুর দল আছে। ব্যবসায়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে আর বেশি শত্রু কে! তাহারাই চক্রান্ত করিয়া জতুগৃহ অচল করিয়া দিবার তাল করিতেছে। আমার নায়িকাদের ফুসলাইয়া, বাঁড়ুয্যের মুখরোচক কথাটিই ব্যবহার করিলাম, বা ভয় দেখাইয়া এ দল হইতে সরাইয়া লইয়া যাইতেছে।

হরিকিশোর অনেক টাকা ইনভেস্ট করিয়াছিল, সে দুঃখ করিয়া বলিল, 'তরুণী আর তরল পদার্থ এক জিনিস ভাই, ঢালু জায়গায় দাঁড়ায় না। এ বড় ঢালু জায়গা—'

গম্ভীর হইয়া গেলাম। কাগজে পর্যন্ত ইহা লইয়া এক কিস্তি হইয়া গিয়াছে। আমাদের চরিত্র লইয়া, অভিনেত্রীদের সহিত সম্পর্ক লইয়া এইবার অপপ্রচার শুরু হইবে বুঝিতে পারিলাম। বুঝিতে পারিয়া আরও শক্ত হইয়া গেলাম, জিদ চাপিয়া গেল। স্থির করিলাম যদি কোনদিন জতুগৃহ তুলিয়া দিতে হয় তাহা হইলে অভিনয়পর্বও চুকাইয়া দিব। জীবনে আর কখনও স্টেজে নামিব না।

কঠোর হাতে স্টেজের লাগাম ধরিলাম। রিহার্সালে আগাগোড়া উপস্থিত থাকি, নতুন নতুন যুবক-যুবতীদের আধুনিক অভিনয় শৈলী শিক্ষা দিই। রীতিমত ক্লাস শুরু হইয়া গেল। সেই সঙ্গে অনুশাসনও বিস্তর। একদিন কানে আসিল অভিনেতাদের মধ্যে একজন কাহাকে যেন বলিতেছে, 'এমন কর্ক-আঁটা সন্ধ্যোবেলা আর

সহ্য হয় না মাইরি, গলাটা জিভটা কাঠ হয়ে থাকে।'

অপরজন উত্তরে বলিল, 'পাঠশালা খুলেছেন যে মশাই, তোতাপাখি তৈরি হচ্ছে।'

আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল, মাতাল দুইটাকে পর দিনই সস্নেহে ডাকিয়া দূর করিয়া দিলাম। এবং ইহারই ফলস্বরূপ কিনা জানি না, জতুগৃহে ভূতের উপদ্রব শুরু হইয়া গেল।

আমি ভূতে বিশ্বাস করি না, কিন্তু আমারও তাক লাগিয়া গেল। বেশ একটু হকচকিয়া গেলাম। আমার বিগতা নায়িকাদের কেউ কেউ অবশ্য পূর্বেই অভিযোগ করিয়াছিলেন এই বলিয়া যে, তাঁহাদের জতুগৃহ ত্যাগের পিছনে লাভ কিংবা লোভের ব্যাপার কিছুই নাই, আছে ভৌতিক উপদ্রব। তাহারা ভূতের ভয়েই ইস্তফা দিয়াছিলেন। একজন রীতিমত অত্যাচারের চিহ্ন দেখাইয়াছিল। তাহার মুখে হাতে ফোস্কার চিহ্ন আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। মিথ্যা রটনা এবং বাতুলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু সেদিন ভাবি নাই। কারণ নায়িকা ছাড়া দ্বিতীয় কোন অভিনেতা অভিনেত্রীর কাছে কোন অভিযোগ এতদিন শুনি নাই। নিজেও কত রাত্রে বাড়ি ফিরিয়াছি, পোড়া-চক্ষে একটা কঙ্কাল কি স্কন্ধকাটাও কখনও পড়ে নাই।

কিন্তু এইবার ভূতের হউক, কি অদ্ভুতের হউক প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হইয়া গেল। চাকর দরোয়ান এবং আর্টিস্টদের কাছ হইতে প্রতিদিন নিত্য-নতুন সংবাদ শুনিতে লাগিলাম। সেদিন রাত্রেও রিহার্সাল চলিতেছিল। শীতের রাত। হিন্দুস্থানী দরোয়ানেরা নাট্যশালার প্রাঙ্গণে বেশ একটুখানি ফায়ার প্লেস তৈয়ারি করিয়া খোশ গল্প করিতেছে। সে গুঞ্জন মধ্যে মধ্যে আমাদের কথাবার্তা থামিলে কানে আসে। দ্বিতলে উত্তর দিকের যে ঘরখানিতে আমরা অভিনয় মক্সো করিতে বসি সেদিকটা স্বভাবতই নির্জন। কারণ জানলার নিচ হইতেই বাগান শুরু হইয়াছে, কাছে-কিনারে

বাড়ি নাই। একটি যমজ অশত্থবট জড়াজড়ি করিয়া অনেকটা উঁচুতে উঠিয়া কয়েক মণ অন্ধকার তাহার ঝুপসী মাথায় ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কী এক অজ্ঞাত কারণে রিহার্সাল হঠাৎ থামিয়া গেল। সকলে বিস্ফারিত চোখে পরস্পরের দিকে থমকিয়া তাকাইল। ঘরের জমাট-বাঁধা বাতাসে সকলেই কি যেন খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। ললিতা, বর্তমান নায়িকা ফ্যাকাশে মুখে আমার দিকে তাকাইয়া বলিল, 'পেলেন ?'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি বলো তো ?'

অন্যান্যেরা বাতাসে শ্বাস-টানার শব্দ করিয়া চাপা গলায় বলিল, 'কেন, সেই গন্ধটা স্যার ?'

একটা চিমসে পোড়াগন্ধ আমারও নাকে আসিয়া লাগিল, মনে হইল খুব কাছে, হয়তো পাশের ঘর হইতেই আসিতেছে। কিছুদিন যাবৎ এই গন্ধটার কথা শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু নিজে কখনো পাই নাই। রাত্রিবেলা ছাড়া নাকি পাওয়া যায় না, এবং তা স্বল্পকালের জন্যই, হয়তো মিনিট পাঁচ-সাত। সচরাচর রাত্রে রিহার্সাল হয় না, আর অভিনয়ের রাত্রে আমি ওই সময়টা (এখানে বলা প্রয়োজন, একটি নির্দিষ্ট সময়েই গন্ধটা কোথা হইতে আসে) সাধারণত স্টেজেই থাকি, তাই কোন দিন পাই নাই।

'একটা পোড়া গন্ধ পাচ্ছি বটে', আমি ভিতরের উত্তেজিত ভাব দমন করিয়া বলিলাম, 'বোধ হয় রামসিংরা ধুনি জ্বালিয়েছে, সেখান থেকে কোনও—।'

'সে তো ওই দক্ষিণ দিকে, অনেক দূরে—'

'তাছাড়া এ কেমন মাংস-পোড়া গন্ধ বলে মনে হচ্ছে না ?'

'কিংবা চুল···'

'তাছাড়া আজই প্রথম নয়—'

'মনে হচ্ছে, খুব কাছ থেকে আসছে।'

'আমি জানি কোথেকে আসছে—'

এতক্ষণ তাহাদের কথা শুনিতেছিলাম, সব শেষে ললিতার কথায় চমকাইয়া বলিলাম, 'তুমি জান কোথেকে আসছে ?'

ইতস্তত করিয়া ললিতা বলিল, 'আজ্ঞে জানি। লেডিস গ্রীনরুম থেকে আসছে !'

সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের ভিতরটা একবার ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। বিদ্যুৎ-চমকের মত জতুগৃহের পুরাতন ইতিহাস আমার মানস-নেত্রে খেলিয়া গেল।

তাহার পর ব্যাপারখানা চাক্ষুষ অনুসন্ধানের জন্য সদলবলে একতলায় লেডিস গ্রীনরুমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গ্রীন-রুমের দরজা খুলিয়া কোনরকম অগ্নিচিহ্ন নজরে পড়িল না। বড় বড় আয়না এবং ড্রেসিং টেবিল, ব্র্যাকেট, ড্রয়ার, কিছু পোশাক পরিচ্ছদ, আরও টুকিটাকি নানাবিধ জিনিস আমরা খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিলাম। কোথাও একবিন্দু আগুন কি ধোঁয়ার চিহ্ন তো নাই-ই, একটা দগ্ধ দিয়াশলাই কাঠি কি সিগারেটের টুকরাও চোখে পড়িল না। অথচ পোড়া গন্ধটার উৎস যে গ্রীনরুমের মধ্যেই, সে বিষয়ে কাহারও আর সন্দেহ রহিল না। সব মিলাইয়া ব্যাপারটা আধা-ভৌতিক ধাঁধার মত মনে হইল। মানুষের চোখের সীমানা যেখানে শেষ হইয়া যায়, মানুষের বুদ্ধি যেখানে বৃথাই ঘুরপাক খাইয়া বেড়ায়, সেখানে হয়ত অতিলৌকিক কোন সত্য লুকাইয়া থাকিলেও থাকিতে পারে, আমি অবিশ্বাস করিব কি করিয়া ?

অবিশ্বাস করিও নাই। ভূত মানি আর নাই মানি, প্রেততত্ত্বে বিশ্বাসী হই বা না-হই কিছুই যায় আসে না, কিন্তু ঘটনাই বলি আর দুর্ঘটনাই বলি তাহাকে অস্বীকার করি কি করিয়া। একটু সময় অন্যমনস্ক ছিলাম আর ঠিক সেই সময়েই ললিতা চিৎকার করিয়া উঠিল, 'আগুন, আগুন !'

ভয়ার্ত চিৎকার যতখানি অন্ধ আর দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয় আর কি! ঘরের সকলেই এক মুহূর্তে আড়ষ্ট হইয়া গেল। ড্রেসিং টেবিলের তলায় যেখানে সিলিংয়ের আলো পৌঁছায় নাই, সেইখানে ললিতার ভীতচকিত দৃষ্টি অনুসবণ করিয়া দেখিতে পাইলাম দুই বিন্দু হলুদ আগুন জ্বলিতেছে। প্রথমটা ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু স্বাভাবিক বুদ্ধি ফিরিয়া আসিতেই অট্টহাসি হাসিয়া ড্রেসিং টেবিলের কাছে গিয়া তাড়া দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সকলকে চমকাইয়া দিয়া একটি মিশকালো মস্ত বড় বিড়াল লাফ দিয়া বাহির হইয়া গেল। বিড়ালটির সঙ্গে সঙ্গে পোড়া গন্ধটিও কি এক আশ্চর্য উপায়ে ঘর হইতে মুছিয়া গেল।

কিন্তু এই ভৌতিক রহস্যের যেমন কিনারা হইল না, তেমনি উপদ্রব ঘুচিয়াও গেল না। নিত্য নতুন ঘটনা ঘটিতে লাগিল। জতুগৃহ সত্যই একটা সমস্যার মত হইয়া দাঁড়াইল। অভিনয় করিতে গিয়া পকেটে হাত ডুবাইয়া কোনদিন চমকাইয়া উঠিয়াছি। মেয়েদের চুলের কাঁটা-ফিতে হইতে শুরু করিয়া এমন অনেক দ্রব্য পাইয়া যাইতে লাগিলাম, যাহা লোক-সমক্ষে বাহির করিলে অভিনয় অপেক্ষা যাদুবিদ্যায় আমার হাতযশ হইত।

অভিনয় রজনীতে নাটক যখন রীতিমত জমিয়া ওঠে, দর্শক যখন চেয়ারে সোজা হইয়া বসিয়া আপন-পর ভুলিয়া যায়, অভিনয়কে অভিনয়-নয় মনে হয়, তখন মঞ্চের নিভৃতে যেন দ্বিতীয় নাটক শুরু হইয়া গেল। একটা অশরীরী উপস্থিতি যে স্টেজে আনাচে-কানাচে ঘুরিয়া বেড়ায়, নানা প্রকার প্রতিক্রিয়া ঘটায়, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া বুঝিতে পারি। ফলে কখনো কখনো পার্ট ভুলিয়া যাই, কয়েক মুহূর্তের জন্য সম্বিৎ থাকে না। এমন হয়, সেকেণ্ডে উইংসের পাশ হইতে গুরুতর নাটকীয় মুহূর্তে হয়তো কেউ খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। এত জোরে হাসিয়া উঠিল যে, আমি চমকিয়া উঠিয়া সম্মুখস্থ দর্শক-মণ্ডলীর মুখের দিকে তাকাইতে বাধ্য হই।

কিন্তু তাহাদের মুখ দেখিয়া ভরসা পাই তাহারা শোনে নাই। স্বকর্ণের সন্দেহ নিরসনের জন্য অতঃপর সেকেণ্ড উইংসের সামনে গিয়া দাঁড়াইবার জন্য মন ছটফট করে, কিন্তু তখন আমি একটি নাটকীয় মুহূর্তে দাঁড়াইয়া আছি। অনেক বিপর্যয়ের পরে কাহিনীর নায়িকার সহিত আমার পুনর্মিলন হইয়াছে। আমরা পরস্পর আলিঙ্গন বদ্ধ, একচুল নড়িবার উপায় নাই, আমার একটি সংলাপ তখনও বাকি, এবং অবধারিত ভাবে আর মাত্র আঠারো সেকেণ্ড পরেই ক্ল্যাপ পড়িবে, করতালিতে প্রেক্ষাগৃহ ফাটিয়া যাইবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই অঙ্কের যবনিকা নামিয়া আসিবে।

আবার এমন এমন হয়, যবনিকা নামিয়া আসিতে আসিতে অর্ধপথে থামিয়া গেল, কিছুতেই আর ভূমিষ্ঠ হয় না। কোনদিন সিনের ওপিঠে সেই কালো বিড়ালটির নখের আঁচড়ের শব্দ শুনিতে পাই, কখনো বা 'হোঁয়াঙ' করিয়া একটি মার্জার-কণ্ঠ ধ্বনিয়া ওঠে। সব মিলাইয়া নাজেহাল হইবার উপক্রম।

ললিতাও পলাইল। সে-ই একমাত্র নায়িকা যে দীর্ঘকাল টিকিয়া ছিল। তাহার কারণ হয়তো ভয়ের চেয়ে অভাব বড়। তাহার পরিবারের একমাত্র উপজীবিকা সে। ভূতের ভয়ে কিংবা উপদ্রবে তাহার স্টেজ ছাড়িলে চলে না। প্রত্যহ স্টেজে আসিয়া সে নানাবিধ অভিযোগ করিত, ভয়-পাওয়ার কাহিনী শোনাইত, এমন কি কাজ ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছাও জ্ঞাপন করিত। কিছুই বলিতাম না, বলিবার আছেই বা কি। শুধু শুষ্ক মুখে যখন বাড়ি ফিরিয়া যাইত, নতুন করিয়া সাহস যোগাইতাম।

কিন্তু সেই ললিতাও একেবারে পলাইল। ট্রেনে কাটা পড়িয়া মারা পড়িল। এবং তাও মালগাড়ির তলায়।

এই মৃত্যুর কোনও ব্যাখ্যা নাই। ইহা আত্মহত্যা হইতে পারে,

আবার নিছক দুর্ঘটনা বলিলেও আপত্তি করিবার কিছু নাই। তবে আমি জানি, এই মৃত্যুর সম্ভবত তৃতীয় উৎস আছে। কারণ, মৃত্যুর কয়েক দিন আগে হইতেই তাহার মৃত্যু-ভাবনা আসিয়া গিয়াছিল। তাহার ধারণা হইয়াছিল যে, কাহারও অলক্ষ্য দুইটি চক্ষু তাহাকে সর্বক্ষণ অনুসরণ করিয়া ফিরিতেছে, প্রায় মৃগয়ার মত এই অনুসরণ তাহার মৃত্যু ভিন্ন বন্ধ হইবে না।

ডাক্তার বলিতে পারেন ইদানিং তাহার মস্তিষ্কবিকৃতি দেখা দিয়াছিল কিনা।

এই মৃত্যু উপলক্ষে জতুগৃহ কয়েকদিন বন্ধ রহিল। সকলেই বিষাদগ্রস্তের মত চুপচাপ রহিল। একমাত্র প্রম্পটার বাঁড়ুয্যে ছাড়া। আমি যখন জতুগৃহ তুলিয়া দিব কিনা মনে মনে হিসাব করিতেছি এবং থিয়েটার বাড়ির নিভৃত ঘরখানিতে বসিয়া কড়া লিকার গলায় ঢালিতেছি, সে অর্থাৎ বাঁড়ুয্যে গিলে-করা কোঁচানো কোঁচার প্রান্তটিকে হাতের মুঠির উপরে বুলবুলির মত ধরিয়া হাজির হইল।

রক্তচক্ষু মেলিয়া তাকাইলাম। বাঁড়ুয্যে কৃতার্থের ভঙ্গিতে ঘাড় কাত করিয়া বলিল, 'আছে।'

'আছে! কি আছে?'

'খবর আছে। জব্বর হিরোইন স্যার। একেবারে ভদ্র ফ্যামিলির শিক্ষিত মেয়ে স্যার। যুবতী—' বলিয়া অর্থপূর্ণ নেত্রে হাসিল।

জতুগৃহে আবার যুবতী। মনে মনে হাসিলাম। মুখে বলিলাম, 'তোমাকে অনেক দিন বারণ করে দিয়েছি বাঁড়ুয্যে, আমি যখন নেশা করব, তখন আমার সামনে এসে তোমার ওই বাঁধানো দাঁতে হাসবে না।'

হিরোইন সত্যই জব্বর যোগাড় হইয়াছে।

বাঁড়ুয্যের চোখ আছে। ইন্টারভিউয়ের ফুল মার্কস পাইয়া

গেল মেয়েটি। বয়স কুড়ি-বাইশ হইবে। অপূর্ব চেহারা। ফিগার দেখিবার মত, যাহাকে বলে ফুল ফিগার।

দেখিলাম। হ্যাঁ, এমন চেহারায় সাইলেণ্ট অ্যাকটিংও চলিতে পারে। কোথায় দেখেছি কোথায় দেখেছি ভাবিতেছি, বাঁড়ুয্যে কানে কানে বলল, 'পঁচিশ বছর আগের চেহারা স্যার।'

চমকাইয়া তাকাইলাম।

'একেবারে তটিনী দেবী স্যার।'

নিষ্পলক চোখে চাহিয়া রহিলাম। তাই তো, এই কারণেই চেনা চেনা লাগিতেছিল বটে। কিন্তু চেহারায় এমন জলজ্যান্ত মিলও থাকে!

একেবারে কনট্রাক্ট ফর্ম বাহির করিলাম, এক বৎসরের চুক্তি। মধ্যপথে জতুগৃহ ছাড়িয়া যাওয়া চলিবে না।

কনট্রাক্ট ফর্ম সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করিয়া মেয়েটি বলিল, 'আগেই সই দিয়ে বেঁধে ফেলতে চান, আগে দেখুন, আমি চলন-সই কিনা।'

ঠোঁটের হাসিটা বড় রহস্যময়। বলিলাম, 'তাহলে কি করতে বল?'

'এক নাইট ট্রায়াল দিতে চাই।'

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িতে গিয়া একটা অদ্ভুত খেয়াল মাথায় চাপিয়া বসিল। এমনি করিয়াই মানুষের মাথায় খুন চাপে বুঝি!

জতুগৃহ একই আছে। অন্তত তেমনই মনে হইবে। পঁচিশ বছর আগে যে নাটক অভিনয় কালে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছিল, তটিনীর অপ-মৃত্যু, সেই নাটককে আবার মঞ্চে টানিয়া তুলিয়াছি। আজ প্রথম রজনী, এবং 'নবনাট্য প্রতিভা'র ভাগ্য পরীক্ষার শেষ রজনী।

দর্শক মহলে চাঞ্চল্য পড়া স্বাভাবিক, কারণ দেওয়ালে তটিনী দেবীর নামে পোস্টার পড়িয়াছে। গ্রীনরুমে বসিয়া জোরহাতে মেক আপ লইতে বসিয়াছি। সীমান্ত বয়সকে যৌবন দিয়া মুছিয়া দিতে

হইবে। নবীন নায়ক সাজিতেছি। রুপোর খনির মত মাথাটিকে চকচকে বার্নিশ কালো করিয়া সবে গোঁফের চিত্রবিদ্যা শুরু করিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়িল আগুন। চিৎকার করিয়া আয়না হইতে মুখ ফিরাইতেই দেখি লাল বেনারসী-পরা হিরোইন আমার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মুখে তির্যক হাসিটি।

মনে হইল বাইশ বছরের ধারালো একখানি শাঁখের করাত। ক্ষুধিত হাসিতে ঝকমক করিতেছে। বুঝিলাম, প্রেমের চেয়েও নির্মম নিষ্ঠুর কিছু আছে। বোতলে কর্ক-স্ক্রু বসাইলাম।

থার্মোমিটারের মত দৃশ্যে অঙ্কে ভাগ করা নাটকে ক্রমে ক্রমে টেম্পো উঠিতেছে। ইহাকেই বলে অভিনয়। রাজযোটকের মত হিরো এবং হিরোইন ম্যাচ করিয়াছে, আর তাহারই ফলে দৃশ্য হইতে দৃশ্যান্তের কাহিনীর আবহ চড়িতেছে। ধীর-লয় হইতে দ্রুতলয়ে। গদি আঁটা চেয়ারের দর্শকরা ডুবিয়া গিয়াছে, একটু গুঞ্জন নাই, আঁট হইয়া অনড় মাথাগুলি জাগিয়া রহিয়াছে, একেবারে নিঃশব্দ, যেন পিনকুশনে একগাদা পিন ঠাসা রহিয়াছে।

উন্মাত্তের মত অভিনয় করিতেছি, পাল্লা দিয়া তটিনী (আসল নাম আজ উহ্যই থাকিল)। পার্শ্বচরিত্রগুলি পুতুল নাচের মত উইংসের ফাঁক দিয়া আসিতেছে যাইতেছে মাত্র। আমার হুঁস নাই। কি শুনিতেছি কি বলিতেছি সেদিকে খেয়াল নাই। প্রম্পটারের অস্তিত্বও ভুলিয়া গিয়াছি। ফুট লাইটের ওপারে অন্ধকারের সমুদ্র। সেখানে বিস্মৃতি, অমনোযোগ। দর্শকের উপস্থিতি অনুভবে পৌঁছাইতেছে না। যখন ক্ল্যাপ পড়িতেছে এবং যবনিকা, তখন একেবারের জন্য আমার মূর্ছা ভাঙিতেছে। এত ভাল অভিনয় জীবনে করিয়াছি কি ? মনে হয় না।

মাথা ঝিম ঝিম করিতেছে। পান মাত্রা সম্ভবত সীমা ছাড়াইয়াছে। তটিনীর সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি দুই হাত কাঁধে রাখিয়া। অধর-ওষ্ঠে বিদ্যুৎ-চমকের মত হাসিটা। গভীর চোখ। মনে হয়

দুই ঝিনুক নীল সমুদ্র। বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ।

নাটকটিকে তটিনী কব্জা করিয়া ফেলিয়াছিল, প্রতিটি দৃশ্য-অঙ্কের যোজনা যেন তাহার নখদর্পণে। নিজ হাতে মেকআপ লইয়াছে তটিনী, সচরাচর যা হয় না। স্টেজের নেপথ্য পথগুলি দিয়া মসৃণভাবে যাতায়াত করিতেছে, কোথাও এতটুকু বাধিতেছে না। যেন ইহা তাহারই ঘর, তাহার হাজার বছরের চেনা। অভিনয়ের মধ্যেও আমি এক একবার ব্যক্তিগত আকর্ষণে তাহাকে স্পর্শ করিতে যাইতেছি, আলিঙ্গনের মধ্যে আনিতে যাইতেছি, কিন্তু আমার কৌশল তটিনী ধরিয়া ফেলিয়া প্রায় বাতাসের মত পাশ কাটাইয়া যাইতেছিল। ঠিক দাবার ব'রের মত, পাশাপাশি দুইটি ছকা রাস্তা যেন, খেলোয়াড়ী চাতুর্যে যেখানে ধরা ছোঁয়ার বাহিরে থাকা যায়।

আমার নেশা ধরিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তটিনীরও কি? তাহার চোখে চোখ রাখিয়া তেমনি মনে হইতেছিল। তাহার দৃষ্টিতে মায়া, হাসিতে মায়া, ভাষা-ভঙ্গিতেও মায়া। মঞ্চে আলেয়ার মত সে নাচিয়া বেড়াইতেছে, একজনকেই পথ ভুলানো যেন তাহার উদ্দেশ্য।

প্রায় শেষ অঙ্কের কাছাকাছি একটি সিচুয়েশন আছে, আমি শুধু তাহারই অপেক্ষায় অভিনয় করিয়া যাইতেছি। সেই নাটকীয় মুহূর্তে তটিনীর নিস্তার নাই, তাহাকে আমার নিকট আত্মসমর্পণ করিতেই হইবে। হইলও। তটিনী ধরা পড়িল। ভিতরে ভিতরে সে কত নার্ভাস হইয়া পড়িয়াছে বুঝিতে পারিলাম। তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতেছে। হাতের আঙ্গুলগুলি বরফের মত ঠাণ্ডা। বুঝিলাম শুধু শীতের জন্য এই শীতলতা নয়, উত্তেজনার জন্যও। যবনিকা নামিয়া আসিতেছে, করতালিতে কানের পর্দা ফাটিবার উপক্রম।

অভিনয় শেষে গ্রীনরুমে গিয়া দ্রুত হাতে মেকআপ তুলিতেছি।

পাশে ডায়েরি খোলা এবং আরও একটি জিনিস খোলা, একটি বেঁটে চ্যাপ্টা বোতলের ছিপি। নিচে ড্রাইভার গাড়ি আনিয়াছে হয়তো এতক্ষণ। তটিনী প্রস্তুত হইয়া দেখা দিবে, অথবা গাড়িতে গিয়া অপেক্ষা করিবে। বাহিরে দর্শকদল প্রবল কোলাহলে আমাদের খুঁজিতেছে। কেহ অটোগ্রাফ-শিকারী, কেহ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সাক্ষাৎপ্রার্থী। গ্রীনরুমের দরজা আঁটিয়া একরকম পলাইয়া আছি। ঠিক এই মুহূর্তে বাহির হওয়া সম্ভব নয়।

এমন সময় দরজায় বার বার অধৈর্য করাঘাত হইল। খুলিতেই দরজার পিঠে আমার চাকরকে দেখিলাম, তাহার পিছনে বিবর্ণমূর্তি আর একটি লোক। কী চাই, জিজ্ঞাসা করিলাম।

লোকটি বিনীত ভাবে জানাইল, তাহার আসিতে অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। এবং আসিবার পরও কেহ তাহাকে ভিতরে ঢুকিতে দেয় নাই। কথা কয়টি বলিয়া একখানি খাম আমার হাতে তুলিয়া দিল। বলিল, 'এবার আমি যেতে পারি? আমাকে আবার নিমতলায়—'

বলিলাম, 'আচ্ছা।'

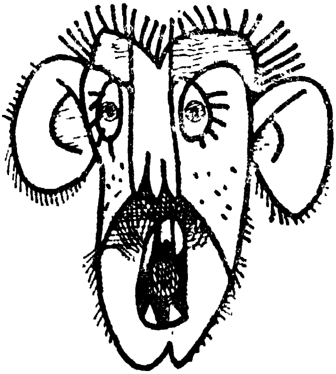
দরজা বন্ধ করিয়া খাম খুলিলাম। ভিতরে দুই ছত্র চিঠি। টেলিগ্রাফের ভঙ্গিতে। আতঙ্কে আমার চোখ ঠিকরাইয়া আসিতে চাহিল। এতবড় অসম্ভব কথা কি করিয়া সম্ভব? তটিনীর বাড়ি হইতে চিঠি আসিয়াছে। সে আজ সন্ধ্যায় ধনুষ্টঙ্কার হইয়া মারা গিয়াছে।

[ডায়েরির লেখা এই পর্যন্ত। এরপরে আর কিছু লেখা নেই। শুধু কয়েকটা বোবা-কালির আঁচড়। অন্ধের মত কেউ যেন সাদা দেওয়ালে হাতড়িয়ে বেড়িয়েছে, কিন্তু কিছুই ধরতে পারে নি। মনে হয় যেন জ্ঞান লোপ হবার প্রাকমুহূর্তে ডায়েরির লেখক আমাদের কাছে কিছু সংবাদ দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সঙ্কেত

শেষ পর্যন্ত এপারে এসে পৌঁছয়নি। পাঠাতে কয়েকটি মেরুদণ্ডহীন অন্ধরেখা জড়িয়ে গেছে পরস্পরে।

সেই সময়কার সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে পরবর্তী ঘটনা জানা যায়। পরদিন ডায়াসের তলা থেকে ভদ্রলোকের প্রাণহীন দেহটা পাওয়া গিয়েছিল। সর্বাঙ্গে ফোস্কার দাগ। দুই চোখ আতঙ্কে ঠিকরিয়ে বেরিয়েছে।

মৃতদেহ সহজেই সনাক্ত হয়েছে, কিন্তু সেই মৃত্যুকে কেউ সনাক্ত করতে পারে নি। জতুগৃহ এখনো এই কলকাতা শহরের বুকেই রয়েছে, তবে অন্য নামে, অন্য চেহারায়। অলিখিত ইতিহাস একদিন মানুষ ভুলে যায়।]



রাস্তায় তার পা নেই, শুধু হাওয়ায় ভাসতে ভাসতেই
এগিয়ে আসছে আমার দিকে

রাত তখন এগারোটা

বিমল মিত্র

ঘটনাটি ঘটল রাত এগারোটার সময়।

কলকাতা থেকে দেশে যাচ্ছি। দেশ বলতে যেখানে আমি জন্মেছি। কলকাতা থেকে ট্রেনে যেতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগে।

সকাল পাঁচটায় একটা ট্রেন আছে। তাতে গেলে মাজদিয়া রেলস্টেশনে সকাল আটটা সাড়ে আটটা বেজে যায়। স্টেশনে নেমে আরও পাঁচ ক্রোশ হাঁটা। খুব তাড়াতাড়ি হাঁটলেও তাতে সময় লাগে আরও দু'ঘণ্টা।

তারপর আর একটা ট্রেন আছে। সেটা ছাড়ে সকাল ন'টায়। তারপরে দুপুর দুটোয়। তারপর সন্ধে ছ'টায়।

সন্ধে ছ'টার ট্রেনে গেলে রাত ন'টায় পৌঁছতে পারা যায় মাজদিয়া স্টেশনে। কিন্তু তাতে গেলে বাড়ি পৌঁছতে রাত এগারোটা বেজে যায় বলে সাধারণত সে ট্রেনে যাই না।

তখন আমি কলকাতার একটা মেসে থেকে পড়াশোনা করি। প্রত্যেক শনিবার দিন দুপুর দুটোর ট্রেনে দেশে যাই। তাতে সুবিধে খুব। ট্রেনে ভিড়ও কম থাকে। আর সন্ধের আগেই বাড়িতে পৌঁছনো যায়।

কিন্তু সব সময়ে সে ট্রেনে যাওয়া সুবিধে হয় না। লেখা-পড়া

ছাড়া ফুটবল খেলার নেশা আছে। রবিবার দিনটায় দেশে না কাটিয়ে কলকাতায় বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কাটাতে বেশি ভাল লাগে।

কোনও শনিবার বাড়িতে না গেলে বাবার চিঠি আসে। লেখেন —"তুমি গত শনিবারে বাড়ি আস নাই কেন ? আমরা তোমার পথ চাহিয়া বসিয়া ছিলাম। তোমার শরীর খারাপ হইল কিনা ভাবিয়া খুবই চিন্তিত আছি। পত্রপাঠ উত্তর দিবে…" ইত্যাদি…

আমি বাবার একই সন্তান। বাবার বয়স হয়েছে। আমাকে নিয়েই তাঁর যত ভাবনা-চিন্তা-স্বপ্ন সব কিছু। আমি বড় হব, আমি মানুষ হব, আমি বংশের মুখ উজ্জ্বল করব।

কিন্তু ততদিনে আমারও একটা নিজস্ব জগৎ গড়ে উঠেছে। দেশের চেয়ে কলকাতার আকর্ষণই আমার কাছে বেশি। আমার জন্যে বাবা মোটা হাত-খরচ পাঠান। সেই টাকা দিয়ে আমি ময়দানে ফুটবল খেলা দেখি, ক্রিকেট খেলা দেখি, আবার কখনও-কখনও বা সিনেমা দেখতে যাই। কলকাতার জীবন গ্রামের জীবনের মতো একঘেয়ে নয়। সেখানে চারদিকে এঁদো পানা-পড়া পুকুর আর কেবল খেত-খামার আর বন-জঙ্গল। আমাদের মতো যাদের অবস্থা ভাল নয় তারা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কেবল বারোয়ারি-তলায় বটগাছের ছায়ায় হারু মুদির দোকানের মাচায় বসে আড্ডা মারে। তাস খেলে। আর আমি গেলে তারা আমার কাছে কলকাতার গল্প শোনে। কারোর কোনও কাজ নেই। বাড়ির অবস্থা খারাপ বলে তারা কলকাতায় আসতে পারে না। সে-পয়সা তাদের নেই। তাই আমাকে তারা একটু-একটু হিংসেও করে। আমার চাল-চলন, জামা-প্যান্ট দেখে তারা অবাক হয়ে যায়।

আমার জুতো, আমার চুল-ছাঁটা, আমার সাবান-মাখা দেখে তাদের তাক লেগে যায়। কারণ, আমাদের গ্রাম এমন এক গ্রাম যেখানে শহরের কোনও সভ্যতা ঢোকবার সুযোগ পায়নি।

আমাদের বাড়ির পাশেই থাকতেন নম্বুকাকা। আসল নাম

বোধহয় ছিল নৃসিংহ ভট্টাচার্য। বাবা তাঁকে নস্তু বলে ডাকতেন। তিনি গ্রামে গ্রামে যজমানদের বাড়িতে গিয়ে পুজো করে বেড়াতেন। বড় ভাল লোক। আমি দেশে গেলেই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। বলতেন, "কী রকম লেখা-পড়া হচ্ছে বাবা? ভালো তো?"

আমি তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতাম। বলতাম, "হ্যাঁ।"

তিনি বলতেন, "হ্যাঁ, খুব মন দিয়ে লেখা-পড়া করবে বাবা। এখন দিন-কাল খুব খারাপ, আর কলকাতা শহরে যে-রকম গাড়ি-ঘোড়া-ট্রাম-বাস শুনেছি, খুব সাবধানে চলা-ফেরা করবে।"

নস্তুকাকা আমাদের দেশের নাম-করা পুরুত-মশাই। তিনি না হলে কারোরই কোনও পুজো-আচ্চা হত না। কেউ হাতেখড়ি দেবে তাতেও যেমন তাঁর ডাক পড়ত, আবার তেমনি কারও বাড়িতে ছেলের অন্নপ্রাশন হবে, তাতেও তাঁকে চাই। তারপর আছে বারোয়ারিতলার দুর্গাপুজো, কালীপুজো থেকে আরম্ভ করে তিন ক্রোশ দূরে জমিদারবাবুদের বাড়িতে যত উৎসব, যত বিয়ে, ব্রত-উদ্‌যাপন, সবেতেই তাঁর ডাক পড়ত।

তা এই আবহাওয়াতেই আমি মানুষ। কিন্তু এই আবহাওয়াতে মানুষ হয়েও যে ঘটনাটা ঘটল তার কথাই বলি।

কলকাতায় তখন আমার স্কুলের পরীক্ষা চলছিল। তিন সপ্তাহ দেশে যেতে পারিনি। বাবাকে সে-কথা লিখে দিয়েছিলাম যে, আমি তিন সপ্তাহের জন্যে দেশে যেতে পারব না।

পরীক্ষা যেদিন শেষ হল সেদিন শনিবার। মেসে এসে ভাবলাম ছুটোর ট্রেন ধরব। কিন্তু কয়েকদিন ধরে রাত জেগে পড়বার পর বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ঘড়িতে তখন সাড়ে বারোটা। ভাবলাম আধঘণ্টা ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।

কিন্তু যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখলাম দেয়াল-ঘড়িতে বেলা সাড়ে তিনটে। আমার বন্ধু, যে আমার পাশের বিছানায় শুত, সেও দেখলাম অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

মনে হল, সর্বনাশ! দুটোর গাড়ি তো কখন ছেড়ে দিয়েছে। এর পরে তো সেই সন্ধে ছ'টার আগে দেশে যাবার আর কোনও গাড়ি নেই। সে-গাড়িতে গেলে দেশের বাড়িতে পৌঁছতে তো সেই রাত এগারোটা বেজে যাবে।

কিন্তু শেয়ালদা স্টেশন থেকে গাড়ি ছাড়তেই সেদিন কেন জানি না আধঘণ্টা দেরি হয়ে গেল। ভাবলাম ট্রেনটা হয়তো একটু দেরি করেই মাজদিয়াতে পৌঁছবে। তার মানে যখন পাঁচ ক্রোশ হেঁটে বাড়ি পৌঁছব তখন রাত বারোটা বেজে যাবে।

বাবা হয়তো বকাবকি শুরু করে দেবেন। বলবেন - দুপুর দু'টোর ট্রেনে আসতে পারলে না?

কিন্তু না, ট্রেনটা ঠিক সময়েই মাজদিয়া স্টেশনে গিয়ে পৌঁছল।

আমি নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম। এদিককার প্লাটফর্ম ছেড়ে উল্টোদিকের প্লাটফর্মে পৌঁছে টিকিট দেখিয়ে গেট পার হলাম। বেশি যাত্রী ছিল না ট্রেনে। গেটের বাইরেই বাজার।

রাত বলেই বাজারে লোকজনের ভিড় বেশ পাতলা। তাড়াতাড়ি বাজার ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে পৌঁছলাম। ভেবেছিলাম একটা সাইকেল রিক্শা ভাড়া করে বাড়ি পৌঁছব।

কিন্তু কোনও রিক্শাওয়ালাই অত দূরে যেতে চাইলে না। বেশি টাকার লোভ দেখিয়েও কাউকে রাজি করাতে পারলাম না।

সবাই-ই এক কথা বললে—অত দূরে সওয়ারি নিয়ে গেলে ফিরে আসতে রাত একটা বেজে যাবে!

আমি বললাম—আমি তোমাদের ডবল ভাড়া দেব।

তবু কেউ যেতে রাজি হল না।

অগত্যা হাঁটতে শুরু করলাম। হাতে অনেক জিনিস ছিল

আমার। বাবা কাশির ওষুধ কিনে নিতে লিখেছিলেন। শেয়ালদা স্টেশনে পৌঁছবার আগে ওষুধের দোকান থেকে তা কিনে নিয়েছিলাম। মার জন্যে নিয়ে গিয়েছিলাম হাজার মলম। মার পায়ে হাজা হয়েছিল। তারপর গামছা কিনেছিলাম একটা বাবার জন্যে। আরও অনেক খুচরো-খুচরো জিনিস কিনেছিলাম—যা যা বাবা কলকাতা থেকে কিনে নিয়ে যেতে বলেছিলেন।

রাস্তা দিয়ে একলা-একলা হেঁটে চলেছি। চারিদিকে নিশুতি অন্ধকার। রাতে গ্রামের লোকজন সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়ে। কারণ ভোর-ভোর উঠতে হয় সকলকে। বড় বড় গাছগুলোকে দূর থেকে অন্ধকারের পাহাড় বলে মনে হচ্ছে।

খানিক দূর গিয়েই পিচের রাস্তা শেষ হয়ে গেল। আকাশে যে চাঁদাটা ছিল তাও ডুবে গেল। তখন শুধু তারাগুলো জ্বলছে মাথার ওপর। মাঝে মাঝে শেয়ালের হুক্কা-হুয়া কানে আসছে। দু-একটা কুকুর আমাকে দেখে ঘেউ-ঘেউ করে ডেকে উঠল। কিন্তু আমাকে চিনতে পেরে আবার চুপ করে গেল। তবু আমার কেমন যেন ভয় করতে লাগল। কিন্তু কিসের যে ভয় তা বলতে পারব না।

একটা রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়ালাম। চারিদিকে কয়েকটা বড়-বড় বটগাছ ডালপালা ছড়িয়ে জায়গাটিকে ঢেকে রেখেছে। শনি-মঙ্গলবার ও-জায়গাটায় হাট বসে। হাট বেলাবেলি শেষ হয়ে গেছে। চারদিকে দু'চারটে ছোট-খাট দোকান। তারাও দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে তখন যে-যার বাড়ি চলে গেছে।

বহু দিন আগে ওই বটগাছের ডালে একজন মানুষ গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। সে ছোটবেলাকার ঘটনা। কিন্তু তখন থেকেই জায়গাটায় এসে দাঁড়ালেই দিনের বেলাতেও কেমন গা-ছমছম করত। আর তখন তো রাত সাড়ে দশটা বেজে গেছে।

মনে পড়ল, বাবা-মা বোধহয় এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছেন। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে রাত হয়ে গেল। তাঁরা ভাবছেন আমি আর আসব না। মা আমার জন্যে ভাত রান্না করে বসেছিলেন।

বাবা বলছেন—আর কেন বসে আছো, খোকা আজকে বোধহয় এল না, তুমি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো।

মা-ও বোধহয় তখন খেয়ে নিয়েছেন। তারপর আমার কথা ভাবতে-ভাবতেই বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

এই সব কথা ভাবতে-ভাবতেই হেঁটে চলেছি। রাত তখন এগারোটা বেজে গেছে। রাস্তাটা গিয়ে নলগাড়ির নাবালে গিয়ে মিশেছে। আগে এখানে একটা নদী ছিল। আগে যখন নদীতে জল ছিল, তখন খেয়া নৌকোয় এপার-ওপার করতে হত। কিন্তু এখন নদীটা শুকিয়ে গিয়েছে। সেখানে ঢালু জমিতে এখন চাষ-বাস হয়। তারই একপাশ দিয়ে গরুর গাড়ি যাবার রাস্তা হয়েছে। বর্ষার পর গরম পড়াতে রাস্তায় আবার ধুলো জমেছে। এখানকার লোক তাই ও-জায়গাটার নাম দিয়েছে 'নলগাড়ির নাবাল।'

আমি ঢালু রাস্তায় নামতে লাগলাম। তারপর সামনের দিকে নজর পড়তেই যা দেখলাম তাতে আমার শরীরের রক্ত হিম হয়ে এল।

দেখলাম ওপারের রাস্তা দিয়ে একটা দাড়িওয়ালা মূর্তি ঢালু রাস্তা দিয়ে আমার দিকে নেমে আসছে। রাস্তায় তার পা নেই, শুধু হাওয়ায় ভাসতে-ভাসতেই এগিয়ে আসছে আমার দিকে।

আমি আর এগোলাম না। এগোতে ভয় করল। ও কি তবে সেই লোকটার মূর্তি যে একদিন বটগাছে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল? তখন কত লোকের মুখে শুনতে পেতুম যে, সে নাকি ওই অঞ্চলে ভূত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু আমি নিজের চোখে কখনও তা দেখিনি।

হঠাৎ আমাকে লক্ষ্য করে মূর্তিটা কথা বলে উঠল।

বললে, "কে ওখানে ?"

আমি কি জবাব দেব বুঝতে পারলাম না। শুধু একটু থেমে বললাম, "আমি।"

"আমি কে ?"

বলতে-বলতে মূর্তিটা আমার দিকে আরও এগিয়ে আসতে লাগল।

সামনে মুখের কাছে এসে বললে, "কে ? কে তুমি ?"

আমি ভয়ে শিউরে উঠেছি তখন। কিছুই জবাব দিতে পারলাম না সেই মূহূর্তে।

মূর্তিটা জিজ্ঞেস করলে, "ও, তুমি ! বিমল ! ধীরেশদার ছেলে ?"

আমার তখন যেন জ্ঞান ফিরে এল ! চিনতে পারলাম মূর্তিটাকে। আমার নস্যুকাকা।

বললাম, "নস্যুকাকা, আপনি ?"

নস্যুকাকা বললেন, "হ্যাঁ, আমি। তা তোমার আসতে এত দেরি হল যে ?"

বললাম, "দুপুর দু'টোর ট্রেনটা ধরতে পারিনি, ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, তাই সন্ধে ছ'টার ট্রেন ধরে আসছি।"

নস্যুকাকা বললেন, "তা, আজকে এই অমাবস্যার রাতে না এলেই পারতে ! এই রাতবিরেতে আসা কি ভাল ? আমাদের গাঁয়ে যে পরশুদিন বাঘ বেরিয়েছিল। তারপর ক'দিন আগে বাবুদের বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল—।"

বললাম, "তা, আপনি এত রাত্তিরে কোথায় যাচ্ছেন ?"

নস্যুকাকা বললেন, "জমিদারবাবুর স্ত্রী হঠাৎ ডেকে পাঠিয়েছেন, তাঁর বড় ছেলের খুব অসুখ, আমাকে সেখানে গিয়ে শান্তি-সস্তেন্ করতে হবে। যত রাতই হোক আমাকে যেতেই হবে। তাঁর বড় ছেলের এখন-যায়-তখন-যায় অবস্থা। তাই খেয়ে নিয়েই দৌড়চ্ছি। আমাকে যে ডাকতে এসেছিল তাকে বলেছি, তুমি

এগিয়ে যাও, আমি খেয়ে উঠেই যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে রাস্তায় কোনও লোকের দেখা হয়নি ?”

আমি বললাম, “কই, না তো—”

নসুকাকা বললেন, “তা রাত্তির বেলা হয়তো ঠাহর হয়নি তোমার। তা, তুমি বাবা একলা এত রাত্তিরে এসে ভাল করোনি। চলো, আমি তোমাকে গাঁ পর্যন্ত পৌঁছে দিই।”

বললাম, “আপনি আবার কেন এত কষ্ট করতে যাবেন। আর আপনারও তো তাড়াতাড়ি আছে।”

নসুকাকা বললেন, “সে কী কথা! এই এত রাতে তোমাকে কি এই অবস্থায় একলা ছেড়ে দিতে পারি ? শুনলে ধীরেশদা যে আমার ওপর রাগ করবে। বলবে, তুমি খোকাকে ওই অবস্থায় একলা ফেলে কী করে চলে গেলে।”

কী আর করা যাবে। ওদিকে জমিদারবাবুর বাড়িতে তাঁর বড় ছেলের এখন-যায়-তখন যায় অবস্থা, আর তিনি কিনা নিজে আমাকে আমার বাড়ি পৌঁছে দিতে চান ?

রাস্তায় যেতে-যেতে নসুকাকা বলতে লাগলেন, “তুমি তিন সপ্তাহ বাড়ি আসনি, সেজন্যে ধীরেশদা খুব ভাবছিলেন। কলকাতায় থাক তুমি, তোমার বয়স হয়েছে। তোমার যত পড়া-শোনাই থাক, হপ্তায় একদিনের জন্যে বাবা-মাকে দেখতে আসতে পার না ? তুমি যখন বড় হবে, আর নিজে বাবা হবে, তখন বুঝবে ছেলেকে দেখতে না পেলে বাপের মনে কী কষ্ট হয়।”

আমি নসুকাকার কথা শুনে কোনও জবাব দিতে পারলাম না, চুপ করে নসুকাকার সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলাম। তারপর যখন বাড়ির কাছাকাছি এসেছি তখন নসুকাকা বললেন, “ওই দেখ, তোমাদের বাড়ি, এবার আর কোনও ভয় নেই, আমি চলি, আমার খুব তাড়া আছে।”

বলে তিনি চলে গেলেন।

আমি আমাদের বাড়ির সদর দরজায় কড়া নেড়ে ডাকতে লাগলাম, "বাবা বাবা, বাবা।"

বাবা আমার ডাক শুনেই ধড়ফড় করে জেগে উঠেছেন। মা-ও জেগে উঠেছেন।

তাড়াতাড়ি দরজা দিয়ে আমাকে দেখে বললেন, "খোকা, তুমি এসে গেছ ? কোন্ ট্রেনে এলে ? দুপুরের ট্রেনে আসতে পারলে না ?

বললাম, "দুপুরবেলা পরীক্ষা দিয়ে এসে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, তাই—"

বাবা বললেন, "তা বলে সন্ধের ট্রেনে আসতে হয় ? জানো বাড়ি পৌঁছোতে রাত এগারোটা বেজে যাবে। তা ছাড়া গাঁয়ে পরশু দিন বাঘ বেরিয়েছিল, তা জানো ? ক'দিন আগে বাবুদের বাড়ি ডাকাত পড়েছিল—"

আমি বললাম, "আমি তো তা জানতুম না। রাস্তায় দেখা হয়ে গেল নসুকাকার সঙ্গে, তিনিই আমাকে নিজে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলেন।"

"নসু ? নসুকাকা ?"

বললাম, "হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে নলগাড়ির নাবালে দেখা হয়ে গেল। তিনি জমিদারবাবুদের বাড়ি যাচ্ছিলেন, তাঁদের বড় ছেলে মরো-মরো, তাই তিনি শান্তি-সস্তেন্ করতে সেখানে যাচ্ছিলেন।"

বাবা আমার দিকে হতবাকের মতো চেয়ে রইলেন।

মা-ও অবাক।

বাবা বললেন, "তুমি ঠিক দেখেছ ? তোমার নসুকাকা ? তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলেছেন ? তুমি কী সব আবোল-তাবোল বকছ ?"

আমি বললাম, "বা রে, আমি ভুল দেখব কেন ? আমি নসু-কাকাকে চিনতে পারব না ?"

বাবা বললেন, "কিন্তু তোমার নসুকাকা যে পরশুদিন মারা গিয়েছেন, আমরা যে নবদ্বীপে গিয়ে তাঁর সৎকার করে এলুম—।"

একটু কাঁচা মাছ পেলেই সব ঠিক হয়ে যেত। এই এক মুশকিল এদের নিয়ে। যত খিদে পাবে তত তাদের ওজন বাড়বে

দাদামশাইয়ের বন্ধু

হিমানীশ গোস্বামী

মামাবাড়ি থেকে চিঠি এল—মেজমামা আসছেন, আমরা যেন অতন্ত সাতদিনের জন্য কালকেপুর যাই। আসল নাম কালিকাপুর কিন্তু সকলেই বলত কালকেপুর! কালকেপুর—অর্থাৎ কিনা আমাদের মামাবাড়ির গ্রাম। ছোট নদী চন্দনা, তার ধারে চমৎকার ছোট গ্রামটি। আমাদের রতনদিয়া গ্রাম থেকে কালকেপুর গ্রাম কিন্তু খুবই কাছে। হাঁটা পথে সাড়ে তিন মাইল। আমরা হেঁটেই যেতাম—নইলে ট্রেনও ছিল, আবার ঐ চন্দনা নদী দিয়ে নৌকায় চড়েও যাওয়া যেত। মেজমামা থাকেন কটকে, বছরে শীতকালে একবার আসেন—সঙ্গে নিয়ে আসেন অজস্র গল্প, তাঁর বন্দুক এবং প্রচুর গুলি। আরও আনেন কলকাতার সেরা সেরা সব বড়দিনের খাবার—কেক, পেসট্রি—এই সব। তা ছাড়া বাড়িতেই কত রকম মাছ পাওয়া যেত, নদী থেকে ধরা টাটকা মাছের রাশি। অনেক সময় অত মাছ খেতে খেতে অরুচি ধরে যেত। এর পরও রোজ নতুন পিঠে তৈরি হতো—সরা পিঠে বকুল পিঠে, চন্দ্রকাঠ—তার উপর মেজমামার শিকার করে আনা পাখির মাংস। জলে-চরা পাখি ছোট স্নাইপ থেকে শুরু করে বড় পাখি গগনভেরী। চল্লিশ বছর আগে দেশে এখনকার মতো জঙ্গল কমে যায় নি—পাখি তো ছিলই প্রচুর, তা ছাড়া আমাদের গ্রামের আশে-পাশে বাঘও এসে পড়ত শীতকালে কখনো সখনো।

কিন্তু মামাবাড়ির চিঠি পড়ে আমরা সেবার যতখানি উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলাম ততখানি না হলেও চলত। সেবার সবই কেমন যেন উলটো-পালটা ঘটে গেল, অবিশ্বাস্য সব ঘটনা। এখনও সবটা যেন ঠিক মত বিশ্বাস হয় না। এটাও ঠিক—সব কথা গুছিয়ে বলতেও পারি না। অনেক-দিক আগে যা ঘটেছে তার সবটা মনে নেই—আবার যে সব ঘটনা ঘটে নি—কেউ কেউ সে কথা বলায় সেগুলো যেন ঘটেছিল বলেই মনে হয়। যাই হোক, আমরা একটা কথা আগেই জানতাম, সেটা হলো দাদামশাই সেই যে পুজোর পর দেশ-ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন তারপর থেকে ছ'মাসের উপর হয়ে গেল তিনি ফেরেন নি। প্রথম সপ্তাহে তাঁর দুটো চিঠি এসেছিল। একটা এসেছিল বেনারস থেকে। তিনি লিখেছিলেন—জায়গা যত ভাল বলে লোকে বলে তত ভাল নয়, তবে এত ভাল বেগুন তিনি কখনও দেখেন নি। তারপর একপাতা ধরে ঐ বেগুনের বর্ণনা ছিল। এর পরের চিঠি এসেছিল কাশ্মীর থেকে। তিনি লিখেছিলেন—চমৎকার জায়গা, তবে বেগুনের অভাব খুব বোধ করছেন। তারপর বেগুন না থাকায় তাঁর কী রকম কষ্ট হচ্ছে, সেটা জানিয়েছিলেন দু'পাতা ধরে। ঐ চিঠির শেষে লিখেছিলেন, এবারে যাওয়ার সময় বেনারস থেকে দু' ঝুড়ি বেগুন আর এক প্যাকেট বেগুনের বীচি নিয়ে যাব।

ব্যস, তারপর দু'মাস আর খবর নেই। তারপরও বেশ কয়েক-দিন কেটে গেল। বাড়ির লোকেরা সাধারণত দাদামশায়ের জন্য চিন্তা তেমন করে না। খেয়ালী মানুষ—কোথাও হয়তো কিছু শিখছেন। হয়তো রাজস্থানে বসে হাতির দাঁতের কাজ শিখছেন, কিংবা মোরাদাবাদে পেতলের কাজ। একবার তো মাদ্রাজে গিয়ে ছবি আঁকা শিখে এসেছিলেন তিনি। তা ছাড়া, শান্তিনিকেতনে গিয়ে কবিতা লেখা শেখা যায় কিনা তা জানতে চেয়ে চিঠিও দিয়েছিলেন তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে। সে চিঠির উত্তর এসেছিল

কিনা—তা আমরা জানি না। বোধহয় আসে নি, এলে নিশ্চয় আমরা জানতে পারতাম। যাই হোক বাড়ির লোকেরা যখন দুশ্চিন্তা শুরু করেছে এমন সময় একটা চিঠি এল তাঁর কাছ থেকে, তাতে তিনি জানিয়েছেন তাঁর আসার তারিখ। বেনারস থেকে তিনি লিখেছেন—এখানে বেগুনের জন্য এসেছিলাম, কিন্তু বেগুন কেনা সম্ভব হয় নি। হরিদাস বেগুন খায় না। বেগুনের নাম শুনলে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। তা ছাড়া, কেবল খায় না তা নয়, বেগুনের গন্ধ পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না। তারপর যেন নেহাত না লিখলেই নয় এমন ভাবে লিখেছেন, হরিদাস আমার বন্ধু। হরিদাস সাধু। ওর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল আসামে—বছর পনেরো আগে। সে আমার সঙ্গে যাবে—এখন থেকে সে কালকেপুরেই থাকবে। ওর জন্য রোজ এক সের করে মাছ লাগবে—যে কোন ধরনের মাছ হলেই চলবে। ছোট কাঁচা মাছই ওর পছন্দ।

তারপর লিখেছেন, স্টেশনে যেন জন দশেক লোক থাকে—আমার সঙ্গে একটা কাঠের বড় বাক্স থাকবে।

ঠিক সেই তারিখের আগের দিনই আমরা কালকেপুরে পৌঁছলাম। দেখলাম মেজ মামা এসেছেন, খাবার-দাবারও প্রচুর—কিন্তু বাড়িতে তেমন আনন্দের আবহাওয়াটা নেই। মেজ মামা বাইরের ঘরে বসে চমৎকার গন্ধওলা তেল দিয়ে বন্দুক পরিষ্কার করছেন দেখলাম। আমাদের দেখে বললেন, —আয় আয়, বোস। তারপর দু'মিনিট চুপচাপ থাকার পর বললেন, —যা ভেতরে যা। ভেতরে গিয়েও দেখি, বাড়ির মধ্যে কেমন যেন একটা অশান্ত ভাব। ছোট-মামাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, বাড়ির সবাই এমন গম্ভীর হয়ে রয়েছে কেন রে? ছোটমামা বলল, মন্দিরের ওখানে গিয়ে বলব, এখানে নয়। ছোট মামা মন্দিরের সিঁড়িতে বসে সব কথা

বলল। সেই চিঠির কথা পর্যন্ত বলে চুপ করল। আমি বললাম,—তাতে আর কী হয়েছে, জন দশেক লোক নিয়ে স্টেশনে গেলেই চুকে যায়। তখন ছোট মামা যা বলল তাতে আমার একেবারে মাথা ঘুরে উঠল। ছোট মামা বলল, চিঠিটায় একটা খটকা আছে বুঝতে পেরেছিস ?

—খটকা ? —আমি প্রশ্ন করলাম।

ছোট মামা বলল,—চিঠিটা পড়ে তোর কোনো রকম অস্বাভাবিক ব্যাপার মনে হয় নি ?

আমি বললাম, কই না তো ? দাতু বন্ধু নিয়ে আসছেন। এটার মধ্যে খটকা কিছু তো লাগছে না। তবে একটা বড় বাক্স আনছেন দাতু, সেটাতে একটু খটকা লাগছে !

—ঠিক ধরেছিস। আর কিছু ?

—আরও খটকা লাগার কিছু আছে নাকি ওতে ?

—তুই একটা বোকা। —ছোট মামা বলল।

—না আমি বোকা নই। —আমি দৃঢ় ভাবে বললাম,—আমি বোকা হব কেন ? এবারে অঙ্কে একশো-র মধ্যে তো আশির উপরে পেয়েছি, বাংলায় পেয়েছি সত্তরের কাছাকাছি—সেও একশো-র মধ্যে।

ছোট মামা বলল,—আরে সে কথা না। ঐ চিঠির মধ্যে আরও একটা মুশকিলের ব্যাপার আছে—তোর মাথায় ঢুকছে না তো ? আচ্ছা, তাহলে বলেই দিই। ঐ যে চিঠিতে আছে না, বাবার বন্ধু মাছ খাবেন রোজ এক সের করে ?

আমি বললাম,—তা মাছ কি এমন খারাপ বস্তু কিছু ? আর এক সের মাছ আমিও খেতে পারি।

ছোট মামা বলল,—কাঁচা ?

আমার তখন ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল। তাই তো—দাতুর বন্ধুর জন্য কাঁচা মাছ লাগবে, রোজ এক সের করে ! হ্যাঁ, তাই কথাটা

দুশ্চিন্তারই বটে। দাদুর বন্ধু হরিদাস সাধু। তিনি খাবেন কাঁচা মাছ। ভাবনারই বটে!

কিন্তু তারপর ছোট মামা যা বলল, তাতে আমার চুল খাড়া হয়ে উঠল, হাত পা জমে গেল ভয়ে।

ছোট মামা বলল, —বাবার বন্ধু হরিদাস কাকা গত মাসে মারা গেছেন বেনারসে জলে ডুবে।

—অ্যাঁ! —আমার আর কথা সরে না। ঐ অ্যাঁ বলেই চুপ মেরে যাই। তারপর অনেকক্ষণ—অনেকক্ষণ পর আমার মুখ দিয়ে মাত্র একটা বাক্য বেরোয়,—সর্বনাশ!

—ঠিক তাই। —ছোট মামা বলল,—দারুণ সর্বনাশ। বাবার বন্ধুর মৃত্যু-সংবাদ খবরের কাগজে বেরিয়েছিল। তাঁর ছবিও ছাপা হয়েছিল। বড় সরকারী চাকরি করতেন তিনি আবগারী বিভাগে। বদলির চাকরি—কখনো থাকতেন হুগলী, কখনও বা বিহারের পূর্ণিয়ায়, কখনো বা নাসিকে। বিরাট চেহারা ছিল তাঁর। ছ'ফুটের উপর লম্বা ছিলেন, আর বেশ মোটাও। ভীমের মতো গোঁফও ছিল।

আমার ভয় করছে রে ছোটমামা! —আমি কাঁপতে কাঁপতে বললাম।

—তোর দোষ কি! বড়দা পর্যন্ত ভাবছে, সকলে মিলে বাড়ি ছেড়ে কোথাও চলে গেলে কেমন হয়। তবে মেজদা বলছে—অনেক বাঘ ভালুক শিকার করেছি, এবারে একটা ভূতকে অন্তত দুটো বুলেট মেরে দেখব ফলাফল কেমন দাঁড়ায়। বাড়ির আর সবাই সর্বদাই ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে।

আমি বললাম,—তা শীত পড়েছে বটে খুব। কাঁপতে আমারও ইচ্ছে হচ্ছে রে ছোট মামা!

ছোট মামা বলল,—শীতে, না ভয়ে?

আমি বললাম,—কী?

ছোট মামা বলল, —সহজ প্রশ্ন! ভয়ে কাঁপতে ইচ্ছে করছে, না শীতে?

আমি বললাম—শীতে। শীতেই কাঁপতে ইচ্ছে করছে। —তারপর একটু থেমে বললাম, —না, ভয়েই কাঁপতে ইচ্ছে করছে। তবে, বলতে ইচ্ছে করছে শীতে কাঁপতে ইচ্ছে করছে।

ছোট মামা বলল, —ব্যাপার খুব সাংঘাতিক। মেজদার দৃঢ় বিশ্বাস, হরিদাস কাকার জলে ডুবে একেবারে সরাসরি গঙ্গাপ্রাপ্তি হলেও তাঁর আত্মা অতৃপ্ত থেকে গেছে, সদ্গতি হয় নি। অর্থাৎ কিনা তাঁর বাড়ির কেউ বোধহয় ঠিক মতো শ্রাদ্ধশান্তি করে নি—বা গয়ায় পিণ্ডি দেয় নি।

আমি বললাম,—হ্যাঁ রে ছোট মামা, গয়ায় পিণ্ডি দিলে কী হয়? ছোট মামা উদাসভাবে বলল,—কিছু পৈতেধারী অসংস্কৃত-মনস্ক ব্যক্তির মুনাফা হয়। আর কী হবে?

আমি বললাম,—কথাটার মানে বুঝিয়ে বলবি একটু?

ছোট মামা বলল,—লোক মারা গেলে তার আত্মা অশান্ত হয়। পৃথিবীর মায়া কাটাতে না পেরে পৃথিবীর হাওয়ায় থেকে যায়, আর তার পুরনো পরিবেশে ফিরে ফিরে আসে।

মানে ভয় দেখায়?

ছোটমামা বলল,—কে বলল ভয় দেখায়? অশান্ত আত্মা অশান্তিতে ভোগে, ছটফট করে, হয়তো দু'একটা কাচের গেলাস ভাঙে, বা বই ছোঁড়ে। কিন্তু কাউকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্য নিয়ে করে বলে কেউ কোনো প্রমাণ এ যাবৎ দেখাতে পারে নি।

আমি বললাম,—এত সব কথা তুই জানলি কেমন করে?

ছোট মামা বলল, —আমি রাঙাদার কাছে শুনেছি। রাঙাদা তো কলকাতার কলেজে পড়ে, সে অনেক কিছু জানে।

আমি বললাম, শোন্ ছোট মামা, আজ বিকেল বেলায়

আমরা দু'জনে সোজা চলে যাই রত্নদিয়া। সাড়ে তিন মাইল পথ, ঘণ্টা দেড়েক হাঁটলেই পৌঁছে যাব।

—কেন ?

আমি বললাম,—কী হবে ঝামেলার মধ্যে থেকে। ভুতুড়ে কাণ্ড আমার একেবারেই বরদাস্ত হয় না।

ছোট মামা এ কথায় বলল, তুই একটা কাপুরুষ।

আমি বললাম,—ঠিক বলেছিস। আমি কাপুরুষ। তুই না যাস, আমি একাই চলে যাব।

ছোট মামা বলল,—এত বড় একটা অ্যাডভেঞ্চারের সুযোগ ছেড়ে দিবি ?

আমি ম্লান হাসলাম।

ছোট মামা বলল,—তুই সেবার বললি না, আফ্রিকায় গিয়ে হাতি গণ্ডার শিকার করবি ?

আমি বললাম, নিশ্চয়—আফ্রিকায় গিয়ে আমি হাতি গণ্ডার শিকার তো করবই। কিন্তু ভূত ? না বাবা, ওতে আমাকে পাবে না।

ছোট মামা বলল,—ঠিক আছে, তুই চলে যা। তারপর আমরা যখন হরিদাস কাকার সঙ্গে কথা বলব, পরকালের কথা জেনে নেব, তখন বলিস না—ইস্, ইস্ তোরা লাকি! জানিস তো, হরিদাস-কাকা গল্প বলেন চমৎকার!

—কিন্তু ভূত তো উনি। যখন বেঁচে ছিলেন তখন হয়তো চমৎকার গল্প বলতেন, কিন্তু এখন ভূত হয়ে কী রকম গল্প বলবেন কে জানে ?

ছোট মামা বলল,—আমার মনে হয় তিনি বললেন অদ্ভুত গল্প! বলে ছোট মামা হি হি করে হাসতে লাগল। আর আমার গায়ে কি রকম শিহরণ খেলে গেল! এরপর হয়তো কাঁপতে শুরু করতাম প্রবল বেগে, কিন্তু ঠিক সেই সময় বড় মামার ডাক শুনতে পেলাম—ওরে তোরা খাবি আয়, কোথায় গেলি ?

চানও করা হয়নি। অন্য কোন দিন হলে চান না করলে মামা বাড়িতে খাওয়া শক্ত ছিল। কিন্তু সেদিন কেউ খেয়ালই করল না।

খাওয়াটাও একেবারে নমো নমো করে সারা হলো। বড় বড় গলদা চিংড়ির মালাই, সরু চালের ঘি-ভাত আর পুকুর থেকে ধরা বড় বড় কই মাছের সরষের বাটা দেওয়া ঝোল থাকলেও, মনটা কি রকম উদাস হয়েই রইল। খাওয়ার দিকে নজরই দিতে পারলাম না।

তারপর রাত্রেও ঘুম এল না। আমি আর ছোট মামা এক খাটে শুয়েছিলাম লেপ গায়ে দিয়ে। সে রাত্তিরটা ছিল খুবই ঠাণ্ডা। অথচ কয়েক মিনিট পরেই মনে হলো খুব যেন গরম লাগছে, আর গা-টাও ঘেমে যাচ্ছে। মনটাকে কিছুতেই স্থির রাখতে পারছি না। বিকেলবেলা বাড়িতে চলে গেলেই আজ ভাল হতো—কিন্তু একা ফিরবার কথা ভাবতেই কি রকম ভয় করছিল আমার। আর ছোট মামাও এমন দুষ্টু যে সে, আমার সঙ্গে যেতেই রাজি হলো না। সে বলল,—ভীরু, তুই একাই যা-না। —বলে কি রকম ইয়ারকির ভঙ্গিতে হেসেছিল। অথচ এটাও তো ঠিক যে ছোট-মামাও দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল! কিন্তু সে দুষ্টুমি করে, বোধহয় আমার ভয় পাওয়া দেখে মজা পাওয়ার জন্যই, আমার সঙ্গে গেল না।

পরদিন ট্রেন রাত দশটায়। আমরা একদল গিয়েছি পাংশা স্টেশনে। যদিও আমাদের স্টেশনে যাওয়ার ব্যাপারে পই পই করে বারণ করা হয়েছিল। আর ভয় পেলেও, আমিও কৌতূহলের জন্যই গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম।

স্টেশনে ট্রেন ঠিক সময়ে থামতেই দাদামশাই নেমে পড়লেন ট্রেন থেকে। তারপর ছুটতে লাগলেন ট্রেনের শেষ দিকে। সেখানে একটা মালগাড়ি থেকে নামানো হলো বিরাট একটা কাঠের বাক্স। সঙ্গে আর কাউকে দেখতে পেলাম না। দাদামশাই বললেন,—এই বাক্সটাকে যেন যত্ন করে নিয়ে যাওয়া হয়।

অবশ্য নিয়ে যাওয়ার কোনো ভাবনা ছিল না, কেননা বড় মামা এবং মেজ মামা দশজন লোক এ জন্য সংগ্রহ করেই রেখেছিলেন। তারা বড় কয়েকটা বাঁশ এনেছিল সঙ্গে। সেই বাঁশগুলি পাশাপাশি আর কয়েকটা ছোট বাঁশ আড়াআড়ি রেখে, দড়ি দিয়ে ভাল করে বাঁধতেই সেটা বেশ একটা শক্ত মাচার মত হলো, তার উপর সকলে মিলে ধরাধরি করে বাক্সটিকে বসান হলো। ঐ বাক্সটিকে আনার জন্য যাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তারা তো আর জানে না ঐ বাক্সে কী আছে, তারা জানলে আর তাদের দিয়ে ঐ বাক্স টানানো যেত না। যাই হোক, বাক্স নিয়ে আমরা নির্বিঘ্নেই রওনা দিলাম। কেবল দেখলাম, মেজ মামা বন্দুকে গুলি ভরা আছে কিনা দেখে নিল। আর বড় মামা দাদামশাই-এর সঙ্গে উত্তেজিত ভাবে কী বলল, সেটা ভাল করে বোঝা গেল না অবশ্য। তারপর আমরা প্রায় জন কুড়ি লোক বাড়ির দিকে রওনা হলাম। দু'জন দুটো লণ্ঠন নিয়ে সামনে সামনে চলল পথ দেখিয়ে। তারপর বাক্সটিকে বাঁশের মাচার উপর রাখা—সেই অবস্থায় জনা দশেক বয়ে নিয়ে চলেছে, যেন বিসর্জনের জন্য প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বাক্সের কাছেই দাদামশাই রয়েছেন। তার পেছনে আবার দু'জনের হাতে লণ্ঠন। মেজ মামা বন্দুক হাতে চলেছে লণ্ঠনধারীদের ঠিক পেছন পেছন, আর বাকিরা সব পেছন পেছন চলেছি। কেবল আমার হাতে রয়েছে একটা বড় টর্চ, সেটা আমাকে দেওয়া হয়েছে কিন্তু জ্বালাবার জন্য নয়, কেবল বইবার জন্যে।

রাত্তিরটা বেশ অন্ধকার। অমাবস্যাই মনে হয়। তবে পরিষ্কার আকাশ। তা থেকে কোটি কোটি নক্ষত্রের ক্ষীণ আলো এসে পড়েছে। তাতে সবটা একেবারে অন্ধকার ঢেকে যায়নি। শীত। মনে উত্তেজনা। আমরা ব্যাপারটা জানি বলে ভয় ভয় করছে। ঠাণ্ডায় আর ভয়ে কাঁপছি। মিনিট কয়েক এই ভাবে চলেছি। হঠাৎ সামনে দাদামশাই-এর আওয়াজ পেলাম,—কই, সঙ্গে মাছ-টাছ আনিস নি কিছু ?

—মাছ ? —বড় মামা বললেন,—মাছ আনব কেন ?

দাদামশায় বললেন,—হরিদাসের ক্ষিদে পেয়েছে। এখুনি মাছ দরকার !

যারা কাঠের বাক্সটা বইছিল তারা এ কথায় কেমন হকচকিয়ে গেল। তা ছাড়া হরিদাসকাকার কথাও হয়তো তাদের কানে গিয়েছিল। তারা বাক্সটিকে মাটিতে নামিয়ে বলল,—এর মধ্যে কী আছে ? আর আপনি কার সঙ্গে কথা কইছেন ? বাক্সটা এত ভারি বা কেন ? ভেতরে কে আছে ?

বুঝলাম, বেয়ারাদের মনেও সন্দেহ এবং ভয় দুই-ই ঢুকেছে।

দাদামশাই বললেন,—ও কিছু না। তোরা চল, তাতাতাড়ি বাড়ির দিকে পা চালা।

লোকেরা বেশ ভয়ে ভয়েই আবার চলতে শুরু করল। কিন্তু এক মিনিট যেতে না যেতেই তারা আবার বাক্স নামিয়ে বলল,—উঃ কী ভারী ! ক্রমশই যেন বাক্সটা বেশী ভারী হয়ে উঠছে !

মেজ মামা বলল,—ওটা কেবল তোদের মনের ভুল। ক্লান্ত হয়ে পড়ছিস কিনা, তাই আরও ভারী ঠেকছে। নে তোল, তাড়াতাড়ি পা চালা।

আবার তারা বাক্সটিকে নিয়ে চলতে শুরু করল। কিন্তু এ বারে কয়েক সেকেণ্ড চলতেই তারা বাক্সটিকে আবার নামিয়ে ফেলল।

দাদামশাই চুপি চুপি মেজ মামাকে বললেন,—মাছ। একটু

কাঁচা মাছ পেলেই সব ঠিক হয়ে যেত। এই এক মুশাকল এদের নিয়ে, যত খিদে পাবে তত তাদের ওজন বাড়বে। কিছু মাছ আমার সঙ্গে আনা উচিত ছিল। ট্রেন লেট করল, নইলে এতক্ষণ বাড়িতেই পৌঁছে যেতাম।

এর পর আর বেয়ারারা বাক্সটিকে অনেক চেষ্টা করেও তুলতে পারল না। দাদামশাই বললেন,—একটু মাছ কেউ যোগাড় করতে পার না তোমরা ? কাঁচা মাছ ?

বেয়ারারা কিন্তু ইতিমধ্যে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছে। তারা বুঝতে পেরেছে একটা কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার চলছে যা তাদের মাথায় ঢুকছে-না ঠিক মতো। আবার এই অস্বাভাবিক অবস্থা, কাঁচা মাছের খোঁজ—দাদামশায়ের বাক্সের সঙ্গে কথা-বার্তা বলায়, ওরা যেন কিছু আঁচও করছে।

তারা বুঝতে পারছে, তারা যে মাল বহন করে নিয়ে চলেছে তাতে নির্জীব কেউ নেই, আবার এটাও বুঝতে পারছে, তার মধ্যে সজীবও কারুর থাকার কথা নয়। বাক্স কখনো এত ভারী হয় ? বিশেষ করে যে বাক্স তারা কয়েক মিনিট আগেই অনায়াসে বয়ে আনতে পারছিল, সে বাক্স হঠাৎ এমন আচমকা ভারী হয় কেমন করে ?

বেয়ারাদের যে প্রধান, সে বলল,—বাবু আমাদের রেহাই দিন। এ মাল বইবার সাধ্যি আমাদের নেই।

দাদামশাই হুংকার দিয়ে বললেন—তোদের গায়ে জোর নেই, —অ্যাঁ, একদম জোর নেই ? দাঁড়া, আমি তোদের সঙ্গে কাঁধ দিচ্ছি, আয় ধর সব।

সকলে মিলে চেষ্টা করল আবার। মাটি থেকে কয়েক ইঞ্চি মাত্র উঠল বাক্সটা—কিন্তু তারপরই ফেলে দিতে হলো। একজন বেয়ারা বলল,—উই বাপ ! এর মধ্যে লুহার হাতি ঢুক্‌ছে !—লুহার হাতি ঢুক্‌ছে। অর্থাৎ কিনা লোহার হাতি ঢুকেছে। কথাটা শুনে

ভয়ের মধ্যেও আমাদের কি রকম হাসি পেয়ে গেল।

মেজমামা বলল, এবারে সকলে মিলে চেষ্টা করা যাক! তখন বেয়ারা দশ জন ছাড়াও, বাকি সবাই চেষ্টা করলাম ওঠাতে। এবারে অবশ্য ওঠান গেল এবং আমরা এবারে খুব তাড়াতাড়ি চলতে লাগলাম। এবার যেন আমরা উড়ে চলেছি, মুহূর্তে পার হয়ে যাচ্ছি অনেকটা করে পথ। এই ভাবে বোধ হয় দু'মিনিট কিংবা তিন মিনিট গেল—এবারে এসে পড়লাম চন্দনা নদীর কাছে। আর বেশি দূর নয়। চন্দনা নদী পার হলেই আমাদের গন্তব্য স্থান।

নদীর ধারে আমরা বাক্সটিকে নামালাম। রেল-ব্রিজের উপর দিয়ে নদী পার হবো, না একটু দূরে গিয়ে কম জলে হেঁটে নদী পার হবো—এ নিয়ে যখন কথা হচ্ছে, তখন একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। হঠাৎ মাচার উপরকার বাক্সটা গড়াতে লাগল নিজে নিজেই! আর সেটা প্রচণ্ড আওয়াজ করে গিয়ে পড়ল চন্দনা নদীর জলে। আবছা অন্ধকারেও জলোচ্ছ্বাস দেখা আর একটু পরেই অদৃশ্য হয়ে গেল বাক্সটা। আমি টর্চটা জ্বেলে দেখলাম, বাক্সটির চিহ্ন মাত্রও দেখা যাচ্ছে না। একেবারেই জলে তলিয়ে গেছে।

দাদামশাই হায় হায় করে উঠলেন। বললেন,—তোরা অমন ঢালু জায়গায় রেখেছিলি বলেই তো বাক্সটা গড়িয়ে গেল?

কিন্তু আমরা দেখলাম, যে মাচার উপর বাক্সটা রাখা ছিল সে মাচাটা বেশ শক্ত সমতল জমির উপর রয়েছে। আরও একটা জিনিস দেখে আমরা অবাক হলাম, সেটা হলো মাচার সঙ্গে যে দড়ি দিয়ে বাক্সটা বাঁধা ছিল, সে দড়িটা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে রয়েছে—যেন একটা প্রকাণ্ড শক্তিশালী রাক্ষস তার ধারাল দাঁত দিয়ে দড়ি কেটে রেখেছে।

দাদামশাই দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তারপর অনেকক্ষণ পর বললেন,— হরিদাসটা বড়ই অধৈর্য! বোধহয় নদীতে মাছ দেখে তার আর তর সয়নি! যাক্, কী আর করা যাবে? সব বাড়ি চল, কাল এসে খুঁজেটুজে দেখা যাবে বাক্সটা।

সে রাত্তিরে আমরা বাড়িতে ফিরলাম বটে, কিন্তু সমস্ত রাত একেবারেই ঘুম এল না। পরদিন ভোর হতে না হতেই আমরা সব নদীর ধারে গেলাম। দাদামশাই দু'চারজন পাকা সাঁতারুকে জলে নামালেন ঐ ঠাণ্ডার মধ্যেই, কিন্তু তারা অনেক খুঁজেও বাক্সটাকে পেল না।

বড় মামা বলল,—বাঁচা গেল।

মেজ মামা বলল,—বাঁচা গেল।

আর আমরা? আমরাও সকলে তাই বললাম।

কিন্তু দাদামশাই বললেন,—মাছের লোভে হরিদাস জলে ডুবে ম'লো।

কিন্তু তা কি সম্ভব? হরিদাস তো আগেই মারা গেছে। কেউ কি দ্বিতীয়বার মরে? আর যদি বাক্সে হরিদাসের ভূতই ছিল, তাহলে ভূতের আবার মৃত্যু কি সম্ভব?

কে জানে। তবে আমরা এরপর আর চন্দনা নদীতে চান করতে যাই নি। যদি,—মানে, ধর হরিদাসকাকা যদি—যাক্ সব কথা স্পষ্ট করে বলা যায়না, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ কী বলতে চাই? এ গল্প এতদিন বলিনি কেন, সেটা আমাকে কেউ কেউ জিজ্ঞেস করেছে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, এতদিন কথাটা মনে করতেই ভয় হতো। তবে সেদিন ছোট মামার সঙ্গে দেখা—এখন ছোট মামারও আমার মতোই অনেক বয়েস। ছোট মামাকে বললাম,—এখনও ঐ কথা মনে পড়লে ভয় হয়।

ছোট মামা বলল,—আর ভয় নেই রে। কতদিন হয়ে গেল না? তারপর জায়গাটা তো আর ভারতবর্ষে নেই, কবে পাকিস্তান হয়ে গিয়েছে, তারপর হলো বাংলাদেশ। হরিদাসকাকাকে আসতে হলে চেক্-পোস্ট পার হয়ে আসতে হবে না? সে বড় হাঙ্গামা। তাছাড়া, উনি ঠিকানাও জানেন না তো।

ছোটমামার ঐ ভরসা পেয়েই আমি আজ লিখতে পারলাম।

হাতুড়ে ডাক্তারের ভুতুড়ে রুগি

কণা বসুমিশ্র

মফস্বল শহর। তারপর আবার শীতের সময়। খুব তাড়াতাড়ি রাত গাঢ় হয়েছে। ঝটিকাচরণ চাকী অনেক দিনের ডাক্তার এই শহরে। যদিও ওঁর নামের পাশে এম বি, এম বি বি এস, এম ডি ইত্যাদি কিছুই নেই। তবু ডিসপেনসরি ওঁর জমজমাট। বাড়িতেই ছোট-খাটো একটা ডিসপেনসরি। সেখানে একটা কাঁচভাঙ্গা আলমারিতে গোটা কয়েক ওষুধ। একটা নড়বড়ে টেবিল আর একটা চেয়ার। রুগিদের বসবার জন্যে গোটা দুয়েক বেঞ্চও পাতা। ঝটিকাবাবুর রুগিরা এই শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরের মানুষ। পাঁচমাইল বলে একটি গ্রাম আছে। সেই গ্রামে তাদের বসতি। বেশির ভাগ মানুষই পূর্ববঙ্গের তাড়া-খাওয়া উদ্বাস্তু। কিছু এদেশী মুসলমান ঘরও আছে। তারা সবাই গরিব মানুষ। ঝটিকাবাবুকে কল দিলে ওরা অনেক সময় ফীজ দিতে পারে না। এই গাছের তরি তরকারি, কলাটা মুলোটা দিয়ে থাকে। ঝটিকাবাবুর দাবি অবশ্য খুব বেশি নয়। উনি এতেই খুশি। রুগিরা অনেকেই বাঁচে না। তাই বলে কেউ ডাক্তারকে দোষারোপও করে না। ভাগ্যের দোহাই মেনে রুগির আত্মীয়-স্বজন কপাল চাপড়ে চলে যায়। মৃত রুগির আপনজনদের শোকের অংশীদার হন ডাক্তারবাবু। ঝটিকাবাবুর চোখের জল গরিব মানুষের মন ভেজায়।

ইনজেকশনের সিরিঞ্জে প্রায়ই ওষুধ থাকে না। তা আর কী করা যায়? ফীজটা যেমন, ওষুধও তেমন! ডাক্তারবাবু ইনজেশনের সিরিঞ্জে ডিসটিলড ওয়াটার ভরে কলেরা, টাইফয়েড, টি বি রুগিকে নির্বিশেষে ছুঁচ ফুটিয়ে যান। বোকা মানুষগুলো পরম নির্ভরতায় তাকিয়ে থাকে হাতুড়ে ডাক্তারের চোখের দিকে। সেদিন রাত গোটা নয়েক হবে। ঝটিকাচরণ চাকী রুগি-টুগি দেখে ডিসপেনসরি বন্ধ করে সবে ঘরে গেছেন। ঝটিকাবাবুর কাজের ছেলেটি ভানুভক্ত ছেত্রী ভাত বেড়ে ওঁকে খেতে ডেকেছে। 'আসছি' বলে ঝটিকাবাবু প্যাণ্ট-ট্যাণ্ট ছেড়ে লুঙ্গিটা সবে হাতে নিয়েছেন, এমন সময় 'ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু!' বলে কে যেন ডেকে ওঠে।

ঝটিকাবাবুর স্ত্রী মারা গেছেন অনেকদিন। নিঃসন্তান ঝটিকাবাবু এই কাজের ছেলেটিকে পুত্রস্নেহে মানুষ করেছেন। সেই ওঁর তদ্বির তদারকি করে। উনি ভানুকে ডেকে বলেন, 'বাইরে যে এসেছে, তাকে বলে দে কাল সকালে আসতে।' বিরক্তিতে কুঁচকে ওঠে ঝটিকাবাবুর ভ্রূ। বয়সের বলিরেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে কপালে। 'আচ্ছা, জ্বালাতন। আমার কি বিশ্রাম-টিশ্রাম নেই?' গজর গজর করতে থাকেন ঝটিকাবাবু।

ওঁর পায়ের কাছে অনেকগুলো পাকা কলা। এক রুগি দিয়ে গেল এইমাত্র। ঝটিকাবাবুর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে কলার ওপরে। সোনার রঙের মতো এমন পাকা মর্তমান কলা! আহা! ঝটিকাবাবুর জিভে জল এসে যায়। ঠিক তখুনি ভানু এসে বলে, 'লোকটা কাঁদো-কাঁদো ভাবে বলছে, তার বউয়ের খুব অসুখ। এখুনি ডাক্তারবাবু না গেলে তাকে বাঁচানো যাবে না।' 'কী মুশকিল! কী মুশকিল!' বলতে বলতে ঝটিকাবাবু ডিসপেনসরির জানলার কাছে এগিয়ে যান। ভানু চেঁচিয়ে বলে, 'বাবু, ভাত খেয়ে গেলে হত না?' ঝটিকা বাবু সে কথা গ্রাহ্য করেন না।

'কে?' বলে ঝটিকাচরণ চাকী মুখ বাড়ান ডিসপেনসরির

জানলায়। রোগা ছিপছিপে একটি লোক এগিয়ে আসে। তার মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। রুক্ষ একমাথা চুল। এর বেশি অন্ধকারে বোঝার উপায় ছিল না। করুণ গলায় লোকটি বলে, 'একবার চলেন ডাক্তারবাবু। ইয়ে আমার ইস্ত্রীর বড্ড অসুখ।'

'আজ নয়। কাল যাব।' গলা খেঁকিয়ে বলেন ডাক্তার।

কিন্তু লোকটি অবুঝ। সে কেবলই বলে, 'চলেন, চলেন। আপনে গরিবের ডাক্তার। গরিবের ওপরে দয়া হবে না বাবু?'

তিরিশ বছর ধরে এই কথাই শুনে আসছেন ঝটিকাবাবু। স্তোকবাক্যে পেট ভরে না। লোকটা হয়ত ফীজ দেবে না। তবু স্বভাবদোষ! এরা ডাকলে উনি না গিয়েও তো পারেন না। কিছুদিন ধরেই ঝটিকাবাবু সর্দি কাশিতে ভুগছেন। গলা ব্যথা। মাথাটাও ঝিম-ঝিম করে। শরীরটা ভাল না থাকায় মেজাজটাও খিঁচড়ে থাকে। উনি তিক্ত গলায় বলেন, 'অন্য ডাক্তার নিয়ে যাও।'

ফ্যাঁচ্ করে লোকটি এবারে কেঁদেই ফেলে, 'আমি তো আপনার জন্যেই…।' ওর কাতর গলার স্বর ডাক্তারের মন ছুঁয়ে যায়। ডাক্তারবাবুর মনে হয়, লোকটা যেন অনেক দিন খায়নি।

'তোমার বাড়ি কোথায়?'

'পাঁচমাইল।'

উনি জানতেন এই উত্তরটাই শুনতে হবে। তবু ডাক্তার বলেন, 'সেই শ্মশানের মধ্যে দিয়ে আমায় এখন যেতে হবে?' লোকটা দেঁতো হাসি হেসে বলে, 'তাতে কী? আপনে তো হামেশাই যান সেখানে।'

ঝটিকাবাবুর আর খাওয়া হয় না। উনি ভাবেন, রুগি দেখে এসেই না হয় খাবেন।

অনেক কালের পুরনো একটা ভাঙা ফোর্ড গাড়ি ছিল ঝটিকাচরণ চাকীর। উনি নিজের গাড়ি চালান। ডাক্তারি করে

যা উপায় হয়, তাতে খেয়ে-পরে আর ড্রাইভার রাখা সম্ভব হয় না। ওঁর গাড়ির এঞ্জিনটাও প্রায় ঝুরঝুরে। যাই হোক, ঠেলেঠুলে ওই গাড়ি নিয়েই ঘোরাফেরা করেন ডাক্তার।

ঝটিকাবাবু গিয়ে বসেন চালকের আসনে। পেছনের সিটে গিয়ে বসে ওই লোকটি।

গাড়ি ছুটছে। ভট্ ভট্ আওয়াজ কেবলই। মনে হচ্ছে পৈতৃক প্রাণটা বুঝি যায়। মরাভরলির রাস্তা ধরে যখন গাড়ি ছোটে, তখন চারিদিকের গাছপালা আর পেঁচার ডাক রীতিমত যেন অন্যমনস্ক করে ডাক্তারবাবুকে। অনেক দূরে টিমটিম করে জ্বলছে কয়েকটা আলো। ঝোড়ো হাওয়া বইছে থেকে থেকে। শীতে কামড়ে ধরছে শরীর। গ্লাভ্‌স পরা হাতটাও মাঝে মাঝে স্টীয়ারিং থেকে ফসকে যাচ্ছে যেন ওঁর। ঝটিকাবাবু বুঝতে পারছন না অ্যাক্সিলারেটরের ওপরে কেন ওঁর দখল নেই আর! গলাবন্ধ কোট। কান মাথায় বেশ করে মাফলার জড়ানো, তবু কেন হু-হু করে ঠাণ্ডা ঢোকে! অ্যাক্সিলারেটরে পা ছোঁয়ানোর আগেই গাড়ি তীরবেগে ছুটতে থাকে। আশ্চর্য! মরাভরলি নদীর পারে কয়েকটা আলো। চিতা জ্বলছে শ্মশানে। এত দূর থেকে লোকজন বোঝার উপায় নেই।

'কী ভাই, আর কদ্দুর?' সামনে অন্ধকার রাস্তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন ঝটিকাবাবু। কিন্তু কোনো সাড়া-শব্দ নেই। লোকটি কি ঝিমুচ্ছে নাকি? স্ত্রীর অসুখ, চিন্তায় ভাবনায় হয়তো সে খুবই ক্লান্ত। তবু এই শীতের রাতে এ ভাবে মুখ বুজে যেতেও ভাল লাগে না ডাক্তারের।

উনি আবারও হাঁকেন, 'কী গো, তোমার দেশ কোথায় ছিল গো?' তবু কোনো উত্তর নেই। পেছন ফিরে তাকান ঝটিকাবাবু। উনি দেখেন, লোকটা ঘাড় গোঁজ করে বসে রয়েছে।

অমাবস্যার রাত। ছিটে-ফোঁটা আলো নেই আকাশে। শেয়াল

ডাকছে। আর কয়েক গজ দূরেই চিতার আগুন। সেই আগুনের চার পাশে গোল হয়ে বসে রয়েছে কয়েকজন লোক। ঝটিকাবাবুর মাথা ধরে ওঠে। বাড়ি থেকে বেরনোর সময় ওঁর প্রাণটা ছটফট করছিল এক কাপ চায়ের জন্যে। উনি ভেবেছিলেন, এই গরিব লোকটি ফীজ দিতে না পারলেও চা দেবে নিশ্চয়। শ্মশানের চিতার আগুন লাল হয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে অমাবস্যার আকাশে। ঝটিকাবাবু ভূত বিশ্বাস করেন না। তবু কেমন যেন একটা অস্বস্তি হতে থাকে। কেসে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে উনি বলেন, 'এসে তো পড়লাম পাঁচমাইল। এবার বলো তোমার বাড়ি কোথায় ?'

লোকটির যেন হুঁশ হয়। 'এবারে ডাইনের রাস্তা ধরুন বাবু।'

'অ্যা, কী বললে ? ওদিকে তো মাঠ মনে হচ্ছে।'

'মাঠ নয়, মাঠ নয়, খানিকটা পোড়ো জমি বাবু।' লোকটা হায়নার মতো খ্যাক খ্যাক করে হাসে। যেমন গেঁয়ো, তেমনি অসভ্য তো, ভাবেন ডাক্তার। আগে জানলে এর সঙ্গে ? আরে দূর ! দূর ! কিন্তু গাড়ি তখন ওঁর আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। এবড়ো-খেবড়ো জমির ওপর দিয়ে গোঁয়ারের মতো গোঁ-গাঁ করে ছুটছে গাড়ি।

'এবারে বাঁয়ে।' লোকটি বলে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা বাঁ দিকে ঘুরে যায়। ডাক্তার ভাবেন, আরে এ তো বড় মজা। গাড়িটা মন্ত্রশক্তি পেয়েছে নাকি ? স্টীয়ারিং ঘোরানোর আগেই গাড়ি ঘুরে যায় ! কিন্তু সামনেই যে একটা জলের রেখা দেখা যায়। সর্বনাশ ! ওটা খাল না ? ঝটিকাবাবু আঁতকে ওঠেন। গাড়ির এঞ্জিনের মধ্যে যেন হাজারটা পাখি ডাকতে থাকে। অনেক কালের পুরনো পাঁজর বের করা ফোর্ড গাড়িটা যেন বিদ্রোহের সুর তোলে। ক্ষুব্ধ, বিরক্ত ঝটিকাচরণ চাকী গলায় ঝাঁজ ঢেলে বলেন, 'কী হে, এই রাত দুপুরে তুমি কি আমার সঙ্গে ফাজলামি করছ ! আর যাব কোথায় ? ওদিকে যে খাদ।'

লোকটি ফের হাসে, সেই বিশ্রী হাসি। ব্রেক কষেন ডাক্তার। প্রচণ্ড জোরে একটা ধাক্কা খেয়ে গাড়িটা থেমে যায়। আর সেই মুহূর্তে লোকটা বলে ওঠে, 'আসুন ডাক্তারবাবু! ওই সামনেই আমার চালাঘর!'

'খালের ওপারে!'

'হ্যাঁ। বাঁশের একটা সাঁকো রয়েছে দেখছেন না? ওই সাঁকোটা পার হয়ে আপনি আসুন।' লোকটির গলায় এবার অনুনয় ঝরে পড়ে।

'আবার বাঁশের সাঁকো? এ সব কথা আগে বলা উচিত ছিল।' বক বক করতে করতে গাড়ির দরজা খুলে নামেন ডাক্তার। তাঁর বেতো, কেসো দেহটার বুকের ওপর যেন হাপর পড়তে থাকে। স্টেথিসকোপ আর ওষুধের বাক্সটা হাতে নিয়ে ডাক্তার হাঁটেন লোকটির পেছন পেছন। সাঁকোর ওপর দিয়ে যাবার সময় ক্যাঁচর ক্যাঁচর আওয়াজ হয়। কিন্তু লোকটির হাঁটা এতই দ্রুত যে, সে চোখের পলকে বাতাসের মতো মিলিয়ে যায়। আজকাল চোখে কম দেখেন ঝটিকাচরণ। বাঁ দিকের চোখটায় সামান্য ছানি পড়েছে। তাই ডাক্তার ভাবেন, ওটা হয়তো ওঁর চোখের গোলমাল। বাঁশের সাঁকো পেরিয়েই একটা চালাঘর। লোকটি যেন আদর করে ডাকে, 'আসুন ডাক্তারবাবু আসুন।'

'তুমি কোথায়? আলো-টালো ধরো।' চাপা রাগে বলেন ডাক্তার। যেন হাওয়ার ভেতর থেকে কথা ভেসে আসে। 'এই যে আমি ডাক্তারবাবু। কেরোসিনের যা দাম আলো জ্বালাব কী করে!'

মাটির দাওয়ায় পা রাখেন ডাক্তার। কতগুলো চামচিকে উড়ে যায়। বহুদিনের পুরনো ধুলোর ভ্যাপসা গন্ধ ডাক্তারের নাকে আসে। তাড়াতাড়ি রুমালটা নাকে চেপে ধরেন উনি। অন্ধকার

ঘুটঘুটে ঘরের মধ্যে থেকে লোকটি বলে, 'ওই তো দরজা। সোজা চলে আসেন।'

ঝটিকাচরণ চাকীর বুকের ওপর যেন পাথরের মতো ভয় চেপে বসে। জীবনে অনেকবারই তো এই এলাকায় এসেছেন ডাক্তারবাবু, কিন্তু এমন গা ছমছম তো করেনি কখনো। এই মুহূর্তে মনে হয় ডাক্তারের, খুব খারাপ জায়গায় উনি এসে পড়েছেন যেন। এখানে কোনো গুণ্ডাদের ঘাঁটি-টাটি আছে। হয়তো কোনো দুরভিসন্ধি আছে ওই লোকটির। যদি ও টুঁটি চেপে ধরে ডাক্তারের? কী নিতে পারে ও? হাতের এই ঘড়িটা? না পকেটের এই সামান্য কটি টাকা! কিন্তু এইটুকুর জন্যে? না, না। এ হতে পারে না। ঘরের মধ্যে পা দেন ডাক্তার। পচা দুর্গন্ধ। ইঁদুর মরে রয়েছে নাকি? না অন্য কিছু? খস-খস আওয়াজ হতে থাকে। সামনেই লোকটি দাঁড়িয়ে। এই অন্ধকারে তার মুখ ভাল করে দেখতে পান না ডাক্তার। শুধু ধবধবে জামাটা আর ধুতিটা চোখে পড়ে। আর লোকটির চোখের মণি দুটো সাপের মণির মতো জ্বল-জ্বল করে। হঠাৎই ডাক্তারের মনে পড়ে যায়, ওষুধের বাক্সে টর্চটা রয়েছে। এতক্ষণ যে কেন মনে পড়েনি, আশ্চর্য! 'কী হল, বসেন ডাক্তারবাবু!' এবারে খাঁটি পূর্ববঙ্গের ভাষায় লোকটা বলে, 'আপনে ভয় পাইতাছেন নাকি?' বুক দুরু-দুরু করে ওঠে ডাক্তারের।

'না, না, ভয় পাব কেন?' কোথায় আপনার পেশেন্ট! বলতে বলতে ডাক্তার ওষুধের বাক্সটা খোলেন। হাতড়ে হাতড়ে টর্চটা বার করেন ডাক্তার। টর্চ জ্বালেন। মাটির মেঝেতে চাদরে ঢাকা একটি মানুষ দেখতে পান ডাক্তার। তার আপাদমস্তক চাদরে ঢাকা। পাশেই একটা জলচৌকি রাখা আছে। যদিও তার ওপরে ধুলোর পুরু সর। ডাক্তারের বসার ইচ্ছে হয় না। উনি উবু হয়ে বসে বলেন, 'এই কি তোমার পেশেন্ট?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু।' এই প্রথম ভাল করে খুঁটিয়ে দেখেন ডাক্তারবাবু লোকটিকে। ওর তোবড়ানো গাল। গর্তে বসা চোখ। চোখের নিচে বিশ্রীভাবে হাড় উঁচু হয়ে আছে। লোকটি কেমন আদেশের মতো সুরে বলে, 'আপনে জলচৌকির উপ্‌রে বসেন।' অগত্যা তাই বসতে হয় ডাক্তারকে। 'এবারে আমার ইস্ত্রীরে দেখেন।' কথাটা বলেই লোকটা অন্ধকারে কোথায় যেন সরে যায়। শোঁ। শোঁ। শব্দে বাতাস ঢোকে বাঁশের খোলা দরজাটা দিয়ে। অনেক দূর থেকে ভেসে আসে, 'বল হরি, হরি বোল।' দূরে কারা যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে শ্মশানের দিকে চলে যায়।

কাঁপা কাঁপা গলায় রুগিকে উদ্দেশ্য করে ঝটিকাচরণ চাকী বলেন, 'আপনি হাতটা বার করুন তো।' তখন সাদা চাদরের মধ্যে থেকে নিঃশব্দে একখানা হাত বেরিয়ে আসে। মুখটা ঢাকাই থাকে। নাড়ি দেখার জন্যে হাতের কব্জিটা ধরেন ডাক্তার। ঝটিকাবাবুর বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। নাড়ির কোনো স্পন্দন নেই। বরফের মতো ঠাণ্ডা শক্ত হাতটা ধুপ্‌ করে পড়ে যায় ডাক্তারের হাত থেকে। এ যেন বেশ কয়েক দিন আগের মৃতদেহ। হা-হা-হা-হা-হা। বাতাস যেন হেসে হেসে চলে যায়। ডাক্তারের কানের কাছে কাদের যেন নিশ্বাস পড়তে থাকে।

'রাম! রাম!' নাস্তিক ডাক্তার জীবনে এই প্রথম মনে মনে রাম-নাম করেন। পড়ি মরি করে ছুটে পালাতে যান ডাক্তার। কিন্তু দরজার কাছে অদৃশ্য মানুষের গলার স্বর 'কেমন দেখলেন ডাক্তার?

'ভাল। ভাল।' পথ আগলে দাঁড়ায় তবু লোকটা। 'একটা প্রেস্‌কিপশন কিংবা নিদেন পক্ষে একটা ইনজেকশন!'

ডাক্তার কি মূর্ছা যাবেন এখন? রাম-নাম মনে মনে জপতে

জপতে অসম্ভব সাহসী ডাক্তার পকেট থেকে কাগজ-কলম বার করে ফস-ফস করে প্রেসক্রিপশন লেখেন। দরজা থেকে সরে না লোকটা। 'ডাক্তারবাবু একটা ইনজেকশন দিন।' কঠিন কণ্ঠস্বর।

নাহ্! লোকটা যে নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত ওই মরা মানুষটার গায়ে ছুঁচ! 'কী হল ডাক্তারবাবু, দেরি করেন ক্যান?' লোকটা যেন প্রায় ধমকে ওঠে। ডাক্তারের মাথার ওপর চামচিকে উড়তে থাকে। উনি শকুনের কান্না শুনতে পান। সামনের শ্যাওড়া গাছের মাথায় শকুনের বাসা। অনেকগুলো শকুন একসঙ্গে সুর মিলিয়ে কাঁদতে থাকে। বাতাসের শব্দ। শকুনের কান্না, চামচিকের লুটোপুটি মিলে-মিশে অদ্ভুত একটা বাজনা তৈরি হয়। ডাক্তারের বুকের মধ্যেও বাজনা বাজে। সেই ডিসটিল্‌ড ওয়াটার ভরা ইনজেকশনের সিরিঞ্জটা মেঝেতে শোওয়া মরা মানুষটার হাতে ফুটিয়ে দেন ডাক্তার। হঠাৎ ওর মুখের চাদরটা সরে যায়। নাকি-নাকি সুরে সে বলে, 'এঁকি, কঁলের জঁল বাঁবু? দঁশ দিঁন আঁগে এঁই ছুঁচ ফুঁটাইয়াই তো আঁমারে মাঁরছিঁলেন ডাক্তাঁরবাবু।'

অ্যাঁ। সর্বনাশ। দশদিন আগে? কিন্তু সে এ বাড়ি তো নয়। অন্য আর একজনের বাড়িতে। হ্যাঁ, এক কলেরা রুগি। ডাক্তার ওষুধের বাক্স ফেলেই এবারে ছুট লাগান। দরজায় ভারী হাওয়া বাধা দিতে চায়, হা-হা-হা-হা, ভেঙে গুঁড়িয়ে যায় কাদের হাসির শব্দ। শকুনেরা কেঁদে যায়। চামচিকে পাখা ঝাপটায়। কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই ডাক্তারের। পেছন পেছন ছুটে আসে কে যেন। নাকি সুরে বলে, 'ডাক্তারবাবু, আঁপনের ফাঁজ? ফাঁজটা। ডাক্তার ছোটেন। ছুটতেই থাকেন।

পিছনে ফিরে তাকিয়ে তিনি দেখেন, সত্যিই কেউ নেই। আবার টর্চ জ্বালাতেই দেখলেন, এই তো করালী তার থেকে মাত্র দু'গজ পিছনে

রাত্রির যাত্রী

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

বিমল চক্রবর্তী থিয়েটারের মহলা দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। মহলা বসে গৈপুরের মিত্তিরপাড়ায়। তাঁর বাড়ি পাশের গ্রামে ইছাপুর। এখন দু গাঁয়ের মধ্যে পিচের রাস্তা হয়ে গেছে। দু'পাশে বাড়ি-ঘর উঠেছে। কিন্তু যে সময়কার কথা বলছি তখন ধুলোভরা মেঠো রাস্তা। দুদিকে বন শিউলি আর আশশ্যাওড়ার জঙ্গল। সবে দেশ ভাগ হয়েছে। কিছু কিছু উদ্বাস্তু পরিবার এসে জঙ্গল সাফ করে ঘরবাড়ি করতে শুরু করেছে।

পুজোর আর দেরি নেই। দেবীপক্ষ পড়ে গেছে। পূজোর তিনদিন থিয়েটার। তিনটি নাটকেই বিমল চক্রবর্তীর বড় পার্ট। ভাল নাটক করেন বলে আশেপাশের গ্রামে তাঁর খুব নামডাক। মনে মনে গর্বও আছে তাঁর। এমনিতেই ভয়-ডর কম। লম্বা-চওড়া চেহারা। ইয়া বুকের ছাতি। বেছে বেছে পার্টও করেন তেমন: বর্গীতে ভাস্কর পণ্ডিত, দুর্গাদাসে দুর্গাদাস, টিপু সুলতানে মঁসিয়ে লালি।

মহলা শেষ হতে ইদানীং একটু বেশি রাত হয়ে যাচ্ছে। এমনিতেই গ্রামের লোকেরা সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়ে। তার ওপর বিমল চক্রবর্তী যখন বাড়ি ফেরেন তখন নিশুতি রাত। চোর

ডাকাত ভূত কাউকেই ভয় করেন না। তবে সাপ আর বুনো শুয়োরের উৎপাত থেকে বাঁচার জন্য হাতে একটি লাঠি আর পাঁচ ব্যাটারির টর্চ নিয়ে চলেন। লাঠি ঠুকতে ঠুকতে কখনও কখনও গুনগুন করে গান গান। মাইল দুয়েকের মতো রাস্তা এইভাবে চলে যান।

অন্য দিনের চেয়ে আজ একটু বেশি রাত হয়ে গেছে। তৃতীয়ার চাঁদ সন্ধের দিকে উঠে কিছুক্ষণের জন্য ফিকে আলো দিয়ে আবার ডুবে গেছে। সারা পথে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। বিমল চক্রবর্তী লাঠি ঠুক-ঠুক করে এগিয়ে চলেছেন আর ভাস্কর পণ্ডিতের পার্টের কথা ভাবছেন।

হঠাৎ পাশের ঝোপ থেকে গোটা দুয়েক শেয়াল ডেকে উঠল হুক্কা-হুয়া। সঙ্গে সঙ্গে দিক্‌বিদিক কাঁপিয়ে প্রতিধ্বনি উঠল—হুয়া হুয়া। দুনিয়ার সব শেয়াল একসঙ্গে ডাকছে। দুটো শেয়াল তাঁর সামনে দিয়েই ছুটে গেল। বিমল চক্রবর্তী টর্চের আলো ফেলতেই শেয়াল দুটোর চোখ ঝকঝক করে উঠল। লাঠি উঁচিয়ে সামনে তেড়ে যেতেই তারা পালিয়ে গেল সামনের ঝোপে। হঠাৎ বিমল চক্রবর্তীর মনে হল, কী একটা বিশ্রী গন্ধ বেরুচ্ছে। কিন্তু গন্ধটা কোথা থেকে আসছে ধরতে পারলেন না। ভাবলেন, ঝোপের ভেতর হয়তো কোন কুকুর-টুকুর মরে পড়ে থাকবে। পকেট থেকে রুমাল বার করে নাকে চাপা দিলেন তিনি।

হঠাৎ টর্চের আলো ফেলতেই দেখলেন একশো গজ দূরে একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। রোগা, লম্বা আধা বয়সী একটি লোক। খালি পা। পরনে আধ ময়লা খাটো ধুতি। খালি গা। পিঠের ওপরে ফেলা খেপলা জাল। ডান-হাত দিয়ে মুঠো করে ধরা। বাঁ হাতে ধরা একটি লাঠি।

লোকটি যেন ভুঁই ফুঁড়ে বেরুল। এই তো কিছুক্ষণ আগে টর্চের আলো সামনে অনেক দূর পর্যন্ত ফেলেছিলেন, কই তখন তো কাউকে দেখতে পাননি।' বিমল চক্রবর্তী হাঁক পাড়লেন, 'এই, কে রে তুই ?'

লোকটি কাঁচুমাচু ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। বিমল চক্রবর্তী কাছে আসতেই বলল, 'পেন্নাম। আমারে চেনবেন না। আমার নাম করালী। খাল ধারে থাকি।'

'এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছিস ?'

'মল্লিকপুর ঘাটে। এ-সময়টায় যমুনোয় খয়রা মাছ ওটে।'

'এত রাতে ?'

'আজ্ঞে আমরা জেলে লোক। রাতবিরেতে তো আমাদের কাজ বাবু।'

চেহারা দেখে বিমল চক্রবর্তীর কোনো সন্দেহ রইল না। লোকটি খাঁটি জেলে। চোর-ডাকাত নয়। মল্লিকপুরের ঘাট তাঁর বাড়ি থেকে আধমাইলের মতো পথ। যাক এতটা পথ তবু একজন সঙ্গী পাওয়া গেল। লোকটি বলল, 'আপনি আগে আগে আলো ফেলে যান কর্তা, আমি আপনার পিছনে আছি।'

বিমলবাবু গল্প করতে করতে পথ চলতে লাগলেন। করালী বলল, তাদের বাড়ি ছিল নভারন। যশোর জেলার এই গ্রাম থেকে বছর খানেক হল এখানে এসেছে। বাড়িতে বউ আর দুই ছেলে-মেয়ে আছে। যমুনা নদীতে মাছ ধরে গোবরডাঙ্গা বাজারে রোজ সকালে মাছ বিক্রি করে। সারারাত মাছ ধরে। দুপুরে ঘুমোয় করালী। বিমলবাবুকে ভাল করে চেনে। বিমলবাবু যে ভাল নাটক করেন তাও জানে। তবে কোনো নাটক সে দেখেনি। করালীর কথাগুলি পেছন থেকে ভেসে আসছিল। কিন্তু কোনো পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। একটা লোক পেছন পেছন আসছে, তার কথা শোনা যাচ্ছে অথচ তার পায়ের শব্দ নেই! এক সময়

বিমলবাবুর মনে হল, করালী বোধহয় পিছিয়ে পড়েছে। পিছনে ফিরে তাকিয়ে তিনি দেখেন, সত্যিই কেউ নেই। আবার টর্চ জ্বালাতেই দেখলেন, এই তো করালী তার থেকে মাত্র দু'গজ পিছনে।

বিমলবাবু বললেন, 'তুই কোথায় ছিলি?'

করালী বলল, 'কেন কর্তা, আমি তো আপনার সাথে সাথেই আসতিছি।'

বিমলবাবু ভাবলেন, তাই হয়তো হবে। তাঁরই দেখার ভুল। নাঃ, বয়স হচ্ছে, এবার হাবড়ার গিয়ে চোখের ডাক্তারকে দেখিয়ে আসবেন।

পরদিনও খাল পার হয়ে বটগাছের কাছে আসতেই করালীর সঙ্গে দেখা হল বিমলবাবুর।

'কী রে, আজও দেখা হয়ে গেল যে।'

'হ্যাঁ, কর্তা, এই সময়ই যে আমি রোজ যাই।'

'কাল কী-রকম মাছ পেলি?'

'অতি সামান্য। বর্ষার জল না পেলি তেমন মাছ ওঠে না—পাঁক ঘাঁটাই সার।'

আজও ঠিক তেমনি খটকা লাগল বিমলবাবুর। করালীর হাঁটাটা যেন কেমন-কেমন। যেন কেউ মেঘের উপর দিয়ে আলতো ভাবে হেঁটে যাচ্ছে। ভাল করে টর্চ ফেলে করালীকে দেখে নিলেন বিমলবাবু। কী রোগা লোকটা। মুখটাও কী সরু! একেবারে যেন ছোট্ট একটা ঝুনো নারকোলের খোলা। মুখে টর্চের আলো ফেলতেই করলী যেন অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল।

করালী বলে উঠল, 'চোখে বাতি ফেললি চোখ জ্বালা করে।' বলেই খিলখিল করে হেসে উঠল। বিমলবাবু অবাক হয়ে ভাবলেন, লোকটা এমন বেয়াদপের মত হাসে। আর হাসিটাও কী বিশ্রী।

এর পর আরো দু'দিন পর-পর দেখা হয়ে গেল করালীর সঙ্গে।

প্রতিবারই দেখা হয় ওই একই জায়গায়। আর প্রতিদিন যে বিমলবাবু একই সময় ফেরেন তাও নয়। যেমন আজ ষষ্ঠীর দিন ফুল রিহার্সাল ছিল বলে ফিরতে রাত একটা হয়ে গেল, অন্যদিন এগারোটা হয়। কিন্তু আশ্চর্য, এই এত রাতেও ঠিক ওই একই জায়গায় দেখা হয়ে গেল করালীর সঙ্গে। বিমলবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'তোমার সঙ্গে দেখছি রোজই দেখা হয়ে যাচ্ছে। তোমার কী ব্যাপার বল তো বাপু? যখনই যে সময় ফিরি তোমার সঙ্গে দেখা হয়!'

করালী হেসে জবাব দিল, 'আমার মাথায় টনক আছে কর্তা। আপনে যখন আসেন তখন টের পাই।'

বিমলবাবু বললেন, 'তাই দেখছি।'

করালী বলে, 'কাল আসছেন তো কর্তা?'

বিমলবাবু বলেন, 'না হে। কাল থেকে তো থিয়েটার আরম্ভ হচ্ছে। রাতগুলি গৈপুরেই কাটাব। তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না। তুমি বরং পারলে থিয়েটার দেখে যেও। আমার পার্ট কেমন লাগল জানিও।'

করালী বলল, 'ইর পরে আবার আপনাদের পালা কবে আছে? ইছাপুর হবে না?'

বিমলবাবু বললেন, 'বঙ্গে বর্গীটা কালীপুজোর সময় করতে বলছিল। কিন্তু আমি থাকতে পারব না। আমি লক্ষ্মীপুজোর পর বেড়াতে বেরুচ্ছি। পাটনা-রাজগীর হয়ে গয়া যাব। বাবার পিণ্ডিটা এবার দিয়ে আসব।'

হঠাৎ করালী আরও কাছে এগিয়ে এল। বিমলবাবু নাকের কাছে একটা বিশ্রী গন্ধ পেলেন। গন্ধটা আসছে করালীর গা থেকে। বোধ হয় আঁশটে গন্ধ।

করালী বলল, 'গয়া যাচ্ছেন?'

বিমলবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, তাই তো যাবার ইচ্ছে।'

'কবে গয়া যাচ্ছেন ?'

'কালী পুজোর দিন ওখানে থাকার ইচ্ছে আছে। অমাবস্যার দিনে পিণ্ডদান করব। কেন, তুমি একথা জিজ্ঞেস করছ কেন ?'

করালী বলল, 'আপনি যদি যান তাহলে আমিও যাই। আমার বাবার কাজটাও সারে ফেলি।'

বিমলবাবু কথাটা শুনে প্রসন্ন হতে পারলেন না। উটকো একটা লোক। চাল-চুলো নেই। যা চেহারা আর পরিচয় পেয়েছেন এই কদিনে তাতে গয়া পর্যন্ত যাবার খরচ আছে কি না সন্দেহ। বুঝলেন, সুযোগ বুঝে ঘাড়ে চাপতে চায়। আর সঙ্গী হিসাবেও লোকটি মোটেই সুখপ্রদ নয়। বিমলবাবু বললেন, 'গয়া যাবার খরচ কিন্তু অনেক।'

করালী বলল, 'টাকা যা লাগে আমি দেব কর্তা।'

বিমলবাবু বললেন, 'তা যেতে পার। এখান থেকে শিয়ালদা। সেখান থেকে পাঠান-কোটে চাপবে। আমি তো অনেক ঘুরতে ঘুরতে যাচ্ছি কিনা।' বিমলবাবু বেশ সন্ত্রস্ত হয়েই কথাটা বললেন।

লোকটি আবার তেমন বিশ্রী ভাবে হেসে উঠল। তারপর বলল, 'কালী পুজোর দিন আমি নিজেই গিয়ে হাজির হব কর্তা। আপনি শুধু আমায় একটু সাহায্য করবেন, তা হলিই হবে। বিদেশে আপনজনের সাহায্য ছাড়া তো যাতি পারি না।'

এড়াবার জন্য বিমলবাবু বললেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে!'

•

পাটনা রাজগীর নালন্দা ঘুরে বিমলবাবু তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র ছেলে শংকরকে নিয়ে কালী পুজোর আগের দিন গয়ায় হাজির হলেন। গয়ায় বাবার কাজ করেই তাঁরা কলকাতায় ফিরে যাবেন।

পরদিন সকালে সাইকেল রিকশায় করে যেতে যেতে হঠাৎ বিমলবাবুর করালীর কথা মনে পড়ে গেল। করালী আসবে বলেছিল।

কিন্তু আবার ভাবলেন, পাগলের খেয়াল। গয়া কি একটুখানি রাস্তা! আর তা ছাড়া বিমলবাবু কোথায় উঠেছেন না উঠেছেন তা করালী জানবে কি করে। কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই লোকটার।

স্ত্রী বললেন, 'এদিক-ওদিক কেন তাকাচ্ছ?'

'না। একটা লোক আসবে বলেছিল।'

'কে বল তো—পাণ্ডা?'

'না, সে তুমি চিনবে না। আমাদের ইছাপুরের লোক।'

কিন্তু মন্দিরের দিকে যেতে যেতে বিমলবাবুর যেন কেন মনে হতে লাগল করালী আসবে, করালী আসবে! মন্দিরের কাছেই পাণ্ডা এসে ধরল। পাণ্ডার নাম শিউপ্রসাদ। পাণ্ডা প্রথমে মন্দিরে নিয়ে গেল। বাইরে থেকে পাদপদ্ম দর্শন করে বিমলবাবু মাথা মোড়ালেন। তারপর স্নান করে ফল্গু নদীর বিস্তীর্ণ বালুর উপর বসে পিতৃপুরুষের তর্পণ করলেন। তর্পণের পর পিণ্ডদান করলেন। ওঁর স্ত্রী আর ছেলে সে সময় মন্দিরে দাঁড়িয়ে। পিণ্ডদান করে সবে উঠেছেন এমন সময় সামনে তাকাতেই চমকে উঠলেন বিমলবাবু। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে করালী। করালীর গায়ে সাদা চাদর। পরনে সেই ধুতি। কিন্তু তার পিঠে ফেলা তেমনই একটি খেপলা জাল। লোকটা কি পাগল—জাল কাঁধে করে এত দূর চলে এসেছে।

'করালী তুমি? কখন এলে?' বিমলবাবু প্রশ্ন করলেন।

করালী বলল, 'এই মাত্তর, আপনারে কয়েছিলাম—আসব। খুঁজতি খুঁজতি ঠিক ধরে ফেলেছি।'

'জাল নিয়ে এসেছ কেন? এখানেও কি মাছ ধরবে নাকি?'

'ওটা অভ্যেস হয়ে গেছে কর্তা। জাল আর জল ছাড়া চলতি পারিনে। আপনার কাছে একটা অনুরোধ কর্তা, আমার পয়সাকড়ি নেই। আমার বাপের নামে যদি একটা পিণ্ডি দিয়ে দেন পাণ্ডাজিরে বলে। বাপ বড় কষ্ট পাচ্ছে। পেরেতলোকে বড় কষ্ট কর্তা।'

ফল্গু নদীর বিস্তীর্ণ চরে শত শত লোক পিণ্ডি দিচ্ছে। সবাই

নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। বিমলবাবুও এইমাত্র পিতৃতর্পণ করে উঠলেন। পিণ্ডদানও শেষ হয়েছে তাঁর। পুন্নাম নরক থেকে তাঁর পিতা উদ্ধার পেয়েছেন। ছেলের কর্তব্য সমধা করলেন এতদিন পরে। মনটা তাই প্রসন্ন। তাই তিনি বললেন, 'ঠিক আছে। পাণ্ডাজি, আর একটা পিণ্ডদান হবে। এই করালী আমার দেশের লোক আছে। এর বাবার নামে একটা পিণ্ড তৈরি করুন।'

নতুন করে আবার সব ব্যবস্থা হল। করালীকে পাণ্ডা জিজ্ঞেস করল, 'আপনার পিতাজির নাম কী আছে?'

'করালীচরণ দাস!' করালী উত্তর দিল। বিমলবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম জিজ্ঞেস করছে না—তোমার বাবার নাম?'

'ওই তো বললাম। করালীচরণ দাস।'

'তোমার নামও যা, তোমার বাবার নামও তাই?' বিমলবাবু একটু রেগে গেলেন।

করালী এবার বেশ রাগ করে জবাব দিল, 'বলছি তো এক নাম।'

পাণ্ডা করালী দাসের নামেই পিণ্ড উৎসর্গ করল। উৎসর্গের শেষে পিণ্ড জলে ভাসাবার জন্য নিয়ে গেল করালীচরণ।

পাণ্ডা শিউরতন বলল, 'আপনার খুব জান-পহচান আদমি বুঝি?'

বিমলবাবু বললেন, 'না, মানে তেমন কিছু নয়।'

শিউরতন বলল, 'যখন মন্ত্র পড়ছিলাম তখন ওর চোখ দুটো যেন জ্বলছিল—ওঃ, কী ভয়ানক চোখ!'

এর মধ্যে বিমলবাবুর ছেলে ও স্ত্রী ফিরে এল। বিমলবাবুর ছেলে শংকর বলল, 'কার কথা বলছেন পাণ্ডাজি?'

'বাবুজির দেশের একটি লোক পিণ্ডি দিতে এসেছিল।'

'দেশের লোক। কে বাবা?' শংকর জিজ্ঞেস করল।

বিমলবাবু বললেন, 'তোদের বলা হয়নি। থিয়েটারের মহলা দিয়ে ফেরার সময় রোজ রাতে ইছাপুরের রাস্তায় করালী দাস

বলে একটি লোকের সঙ্গে দেখা হত। লোকটি ওই সময় মাছ ধরতে যেত। লোকটি আমায় বলেছিল পিণ্ডি দিতে গয়ায় আসবে।'

'কার পিণ্ডি?'

'তার বাবার—আশ্চর্য, তার নামও করালী দাস।'

'লোকটা কী-রকম দেখতে বল তো? রোগা লম্বা মতো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুই চিনিস?'

শংকরের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে বলল, 'তুমি বলছ কী বাবা? ওই করালী দাস তো এক বছর আগে যমুনায় মাছ ধরতে গিয়ে জলে ডুবে মারা যায়। তুমি সে সময় গ্রামে ছিলে না। আমি দেখতে গিয়েছিলাম। বর্ষাকালে জলের তোড়ের মুখে পড়ে যায়, আর উঠতে পারে না। গাইঘাটা পুলের কাছে ডেড বডি পাওয়া গিয়েছিল।'

বিমলবাবু বলে উঠলেন, 'হতেই পারে না। জলজ্যান্ত লোক! এইমাত্র সে এখানে ছিল। যে মারা গেছে সে হয়তো তার বাবা।'

'যে মারা গেছে ভাল করে জানি সেই-ই করালী দাস। তার ছেলেপুলে ছিল না। তার বউকে আমি দেখেছি। তুমি বললেই হবে।'

বিমলবাবু বললেন, 'বেশ, চল তোকে দেখাচ্ছি। ওই তো করালী ওই দিকেই গেছে।'

তখন বাপ ছেলেকে নিয়ে বিস্তীর্ণ বালুভূমিতে করালীর সন্ধানে বের হলেন। ফল্গু নদীর তীর জনাকীর্ণ। চারদিক খুঁজে কোথাও করালীকে পাওয়া গেল না। খুঁজতে খুঁজতে বোধিগয়ার দিকে আর একটু এগিয়ে যেতে বিমলবাবু হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন, 'আরে, ওই তো করালী যাচ্ছে!'

শংকর লক্ষ্য করল, প্রায় দুশো গজ দূরে দিয়ে রোগা মতো একটি লোক হেঁটে যাচ্ছে হনহন করে। তার গা সাদা চাদর

দিয়ে ঢাকা। বাঁ কাঁধে ফেলা একটি জাল। লোকটি ডান হাত দিয়ে কী যেন খেতে খেতে যাচ্ছে।

বিমলবাবু চিৎকার করে উঠলেন, 'করালী—ক-রা-লী।'

আশ্চর্য! করালী থামল না। বরং চলার গতি বাড়িয়ে দিল।

বিমলবাবু বললেন, 'শংকর, ছুট লাগা 'ওকে ধরতেই হবে।'

তখন দু'জনেই ছুটতে লাগলেন।

কিন্তু কী আশ্চর্য। করালীকে কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না। যতই ছুটছে ততই মনে হচ্ছে, করালী সেই একই দূরত্বে হেঁটে চলেছে।

বিমলবাবু ও শংকর তার পিছনে পিছনে ছুটছেন। পড়ন্ত বেলায় ফাঁকা বিস্তীর্ণ নদী তীরে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া হু-হু করে বয়ে চলেছে। তারপর এক সময় ক্লান্ত হয়ে ওঁরা বালুর উপর বসে পড়লেন। প্রচণ্ড পিপাসায় দু'জনেরই গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

সেই অবস্থায় দু'জনেই দেখতে পেলেন একটা সাদা ছায়ামূর্তি অনেক দূরে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

সেই মুহূর্তে ওদের দু'জনের সারা শরীর এক অজানা আতঙ্কে শিরশির করে উঠল। ওদের অচৈতন্য দেহ ফল্গুর ধু-ধু বালুভূমির উপর লুটিয়ে পড়ল।

হাত দু'খানা হঠাৎ দশ গুণ লম্বা হয়ে গিয়ে, গোল লাইন অতিক্রম করার ঠিক আগে বলটিকে আঁকড়ে ধরে সাঁত করে টেনে নিল তার বুকে

ভুতো

অজেয় রায়

এক ধারে একটা মজা পুকুর, দু পাশে চাষের খেত এবং অন্য ধারে উঁচু-নিচু শক্ত কাঁকুরে ডাঙা। মাঝখানে একফালি ঘাসে-ঢাকা সমতল জমি—বটতলা স্পোর্টিং ক্লাবের ফুটবল গ্রাউণ্ড। রামপুর গ্রামের একদল ছোট ছোট ছেলে এইখানে প্রায় সারা বছর ফুটবল খেলে।

ক্লাবের নাম 'বটতলা স্পোর্টিং' দেওয়ার কারণ গ্রাউণ্ডের পশ্চিম দিকে ওই রুক্ষ জলাভূমির প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে এক অতি প্রাচীন বিশাল বটগাছ।

এক গ্রীষ্মের দিনে, সূর্য সামান্য পশ্চিমে হেলে পড়তেই বটতলা স্পোর্টিংয়ের ছেলেরা ফুটবল-বগলে মাঠে এসে উপস্থিত হল। চটপট লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল সবাই, তারপর শুরু হল টিম তৈরি।

একটা গণ্ডগোল বাধল। এ-সমস্যা প্রায়ই ঘটে। মোট পনেরো জন ছেলে এসেছে। অর্থাৎ একদিকে থাকবে আট জন, অন্যদিকে সাত। এই রকম বিজোড় সংখ্যা থাকলে টিম ভাগাভাগি নিয়ে প্রথমেই একচোট ঝগড়াঝাঁটি লাগে, অতঃপর কিছু একটা রফা হয়। কিন্তু সেদিন দু'দলের ক্যাপ্টেন, নিতাই এবং হারু, দু'জনেই

জেদ ধরে বসল, কিছুতেই সাত জনে খেলবে না।

অন্যরা অধৈর্য হয়ে উঠেছে। ধুত্তেরি। পা সুড়সুড় করছে তাদের। হঠাৎ গোপাল গ্রাউণ্ডের সীমানায় দাঁড়ানো একটি ছেলেকে ডেকে বলে উঠল, 'এই, তুই খেলবি? ফুটবল খেলতে জানিস?'

সবার নজর পড়ল ছেলেটার ওপর। কালো, রোগাটে, পরনে মলিন ছিন্ন হাফ প্যান্ট ও হাফ শার্ট। বয়স বছর চোদ্দ হবে। মাঝারি লম্বা। বড় বড় চোখ দুটি। মুখখানা বেশ মিষ্টি। কয়েক-দিন ধরে এই অচেনা ছেলেটি মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে তাদের খেলা দেখে। গোপাল জিজ্ঞেস করা মাত্র সে ফিক করে হেসে ঘাড় হেলিয়ে বলল, 'হুঁ।'

ব্যস, সমস্যার সমাধান। নতুন ছেলেটা পড়ল হারুর ভাগে। হারু তাকে বলল, 'এই তোর নাম কী রে?'

ছেলেটা উত্তর দিল, 'ভুতো।'

শুনে সবার কী হাসি।

হারু বলল, 'ভুতো, তুই গোলে খেল।'

ভুতো মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল, 'বেশ।'

বটতলা স্পোর্টিংয়ের একজনই মাত্র নিয়মিত গোলকীপার, রবি। সে ম্যাচে গোলকীপিং করে, প্র্যাকটিসে এক দলের গোলকীপার হয়। কিন্তু আর কেউ গোলে খেলতে চায় না। তাদের মতে ফুটবল পায়ের খেলা, হাতে বল ধরে সুখ নেই। তাই রবির উল্টো পক্ষে গোলে কে খেলবে তাই নিয়ে ঝঞ্ঝাট লাগে। কেউ বেশিক্ষণ গোল পোস্ট আগলে দাঁড়িয়ে থাকতে চায় না। অতি বিরক্তিকর কর্তব্য। আবার গোল খেলে গোলির ঘাড়েই যত দোষ চাপে। ফলে রবির প্রতিপক্ষে দু'তিনজনকে পালা করে

গোলে পাঠানো হয়। কাউকে একটু বেশি সময় গোলে খেলতে হলেই সে এমন চেঁচামেচি জুড়ে দেয় যে, তাকে তখন এগিয়ে দিয়ে অন্য কাউকে গোল রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করতে বাধ্য হয় ক্যাপ্টেন। সেদিন রবি গেছে নিতাইয়ের দলে। তাই ভুতো এক কথায় গোলে খেলতে রাজি হওয়ায় হারুর টিমের প্লেয়াররা এই নতুন ছেলেটার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে উঠল।

হারু মনে মনে একটু চিন্তিত হয়। এই উটকো ছোঁড়া কেমন খেলে, কে জানে। শেষে টপাটপ এক গাদা গোল খেয়ে না ডোবায়! আচ্ছা, দেখা যাক। তেমন বেগতিক বুঝলে না হয় পালটে দেব।

খেলা চলতে চলতে বটতলা স্পোর্টিংয়ের ছেলেরা টের পেল, ভুতো মোটেই আনাড়ি নয়। সে রীতিমত ভাল গোলকীপার। কয়েকটা শক্ত শট দিব্যি আটকাল। সবাই বুঝল, ও রবির চেয়ে কোনো অংশে খারাপ খেলে না। বরং একখানা বডি-থ্রো যা দেখিয়েছে, অমন রবিও পারবে কিনা সন্দেহ।

খেলার পর সবাই ভুতোকে ঘিরে ধরল। ওর খেলার প্রশংসাও করল। ভুতো গদগদ মুখে দাঁড়িয়ে রইল। হারু বলল, 'তুই থাকিস কোথায়?'

'হুই দিকে।' ভুতো বটগাছটার দিকে আঙুল তুলে দেখায়।

ও বটগাছটার পিছনে আছে মস্ত আম-কাঁঠালের বাগান। তার পরে পঁচিশ-ত্রিশ ঘর লোকের বাস। তারা কেউ ধোবা, কেউ জেলে, কেউ মিস্ত্রি। কেউ বা চাষের খেতে খাটে। ছেলেরা বুঝল, ভুতো ওই পশ্চিম পাড়ার ছেলে। ওখানকার ছেলেরাও ফুটবল খেলে। তবে তাদের অবস্থা ভাল নয়। সব সময় বল জোগাড় করতে পারে না, তাই নিয়মিত খেলা হয় না। পশ্চিম পাড়ার সঙ্গে এ-দিককার ছেলেদের তেমন ভাবসাব নেই।

নিতাই জিজ্ঞেস করল, 'তুই কোন ইস্কুলে পড়িস? কোন ক্লাসে?'

ভুতোর মুখ কেমন শুকিয়ে গেল। আস্তে আস্তে বলল, 'পড়তাম প্রাইমারীতে, এখন আর পড়ি না।'

পশ্চিম পাড়ার অধিকাংশ ছেলের ভাগ্যই এমনি। তাদের লেখাপড়া বেশি দূর এগোয় না। অল্প বয়সেই রোজগারের ধান্দায় নেমে পড়তে হয়। বাপ-জ্যাঠার কাজে সাহায্য করে। পড়াশুনা হবে কী করে ?

তা যাকৃগে। ভুতোর ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার মনে করল না বটতলা ক্লাবের ছেলেরা। তারা তাকে উৎসাহ দিয়ে বলল, 'তুই প্রত্যেক দিন আসবি খেলতে, বুঝলি ?'

মাসে মাসে পঁচিশ পয়সা চাঁদার কথাটাও তুলল না তারা। যদি ও দিতে না পারে এবং সেই লজ্জায় না আসে !

ভুতো মিটমিট করে হেসে ঘাড় দুলিয়ে জানাল, 'হুঁ আসব ঠিক।'

এমন একজন খাসা গোলকীপার পাওয়ার সম্ভাবনায় বটতলা ক্লাবের ছেলেরা ভারি খুশি। কেবল রবি এই নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীর আগমন মোটেই সুনজরে দেখল না। সে মুখ হাঁড়ি করে রইল।

ভুতো রোজ বটতলা ক্লাবে ফুটবল খেলতে আসতে লাগল। সবার আগে এসে সে মাঠে দাঁড়িয়ে থাকে। বটতলা স্পোর্টিংয়ের ছেলেদের দূরে বল হাতে আসতে দেখলেই তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দিন দিন তার ফর্ম যেন খুলতে লাগল। সবাই বুঝে গেল, এবার থেকে ম্যাচে গোলে রবির কোনো চান্সই নেই, কারণ ভুতো খেলবে।

ভুতো ছেলেটার স্বভাব বেশ ভাল। ঠাণ্ডা, চাল-টাল নেই। যে যা বলে, চুপ করে শোনে। কথা বলে খুব কম। একটু কিছু মজার ব্যাপার হলেই ফিক্ ফিক্ করে হাসে। খেলার শেষে সন্ধের ঝোঁকে সে একা একা ঘরে ফিরত। বটগাছের তলা দিয়ে যে সরু পথটা গেছে পশ্চিম পাড়ায়, তাই ধরে চলে যেত।

বটতলা স্পোর্টিং দুটো ম্যাচ খেলল। দুটোই জিতল। গোলে খেলল ভুতো, রবি থাকল রিজার্ভে। একটা রামপুরেরই অন্য পাড়ার টিম, অপরটা ছিল পাশের গাঁয়ের। এ দুটো দল তেমন জোরালো ছিল না। গোলে বল এসেছিল কম। যে ক'টা এসেছে, ভুতো অনায়াসে আটকাল। এরপর একদিন হারু প্রস্তাব করল, 'এবার খালপাড় ইউথের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করে দি, কী বলিস?'

রামপুর থেকে মাইল তিন দূরে ভরতপুর গ্রাম। সেখানকার এক ফুটবল দল—খালপাড় ইউথ ক্লাব। রেল লাইনের ধারে খালের পাশে তাদের গ্রাউণ্ড, তাই ক্লাবের এই নাম। বটতলার সঙ্গে খালপাড় ক্লাবের চিরশত্রুতা বা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বিতা। প্রতি বছর দু' দলে একবার ফুটবল ম্যাচ হয়। খালপাড় ক্লাবের অবস্থা বটতলার চেয়ে কিছু আহামরি নয়। সেখানেও পনেরো-কুড়িজন ছোট ছেলে পুরনো ফুটবল নিয়ে প্রায় বছরভোর পেটাপেটি করে। তবে গত দু' বছর বটতলা কিন্তু খালপাড়ের বিরুদ্ধে সুবিধে করতে পারছে না। দু'বারই হেরেছে। এই বছর খালপাড় ইউথের বটতলা গ্রাউণ্ডে খেলতে আসার কথা। কারণ, আগের বছর বটতলা গিয়েছিল ভরতপুরে। হোম-গ্রাউণ্ড এবং ভুতো গোলকীপার, সুতরাং বটতলার প্লেয়ারদের আশা জাগল, এ বছর খালপাড়কে তারা এক-চোট দেখে নেবে। পূর্ব পরাজয়ের শোধ তুলবে। পরদিনই খালপাড় ক্লাবের সঙ্গে বটতলা ম্যাচ চ্যালেঞ্জ করে বসল।

ম্যাচের তিন দিন আগে রবি একটা খারাপ খবর শোনাল। রবি বলল, 'খালপাড়ের জগাকে আজ সকালে দেখলুম পশ্চিমপাড়া থেকে বেরুচ্ছে। হঠাৎ ওর ওখানে যাবার মানে?'

নিতাই বলল, 'আবার কী, হয়তো জেলেদের খোঁজে গিছল, মাছ ধরাবে, ওদের তো পুকুর আছে।'

রবি গম্ভীর বদনে মাথা নাড়তে নাড়তে জানাল, 'উঁহু, জগাকে আমি চিনি, বেটার পেটে শয়তানি। আমার ধারণা, ও গিয়েছিল

ভুতোর খোঁজে। নিশ্চয়ই ওরা ভুতোকে বাগাতে চায়।'

সর্বনাশ। রবির কথা শুনে অন্যদের টনক নড়ে গেল। ভুতোর খ্যাতি কি খালপাড়ে পৌঁছেছে?

সেদিন বিকেলে ছেলেরা ভুতোকে চেপে ধরল। 'অ্যাই, খাল-পাড়ের কোনো ছেলে গিছল তোর কাছে?'

'কই, না।' ভুতো উত্তর দেয়।

হারু উপদেশ দিল, 'খবরদার, ওদের কারো সঙ্গে কথা বলবিনে।'

ভুতো ঘাড় নেড়ে জানাল, 'বেশ।'

বলাই কিঞ্চিৎ কাঠখোট্টা প্রকৃতির। চোখ গরম করে বলল, 'তুই যদি আমাদের লাস্ট মোমেন্টে বিট্রে করে কেটে পড়িস, তবে ভাল হবে না বলে রাখছি।'

'না না, আমি চলে যাব কেন?' ভুতো সচকিত হয়ে বলল, 'আমি তোমাদের দলেই খেলব।'

ভুতোর কাছে আশ্বাস পেয়ে বটতলা ক্লাব আপাতত নিশ্চিন্ত হল। কিন্তু পরের দিন রবি আবার এক সন্দেহ ঢুকিয়ে দিল মনে। রবি ক্যাপ্টেন হারুর বাড়ি বয়ে এসে জানাল, 'আজ সকালে ফের দেখলাম খালপাড়ের গজা পশ্চিম পাড়ার মাঠ দিয়ে চলে যাচ্ছে। কী ব্যাপার বল তো?'

হারু কিছু ভেবে না পেয়ে মাথা চুলকোয়। আমতা আমতা করে, 'গজা হয়তো হাটে যাচ্ছিল। আর ভয় কী, ভুতো তো কথা দিয়েছে আমাদের ছাড়বে না।' রবি ভুরু কুঁচকে ফিসফিসিয়ে বলল, 'কিন্তু যদি ঘুস খায়?'

'অ্যাঁ?' শুনে হারুর চক্ষু ছানাবড়া। ভুতো গরিব ঘরের ছেলে, দু'চার টাকার লোভে তার পক্ষে ফাঁদে পা দেওয়া অসম্ভব নয়। তখুনি বটতলার কয়েকজন সভ্য জড় হয়ে পরামর্শে বসল।

যা হোক, স্থির হল ভুতো প্রথমে তো নামুক, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। তবে ভুতো সম্বন্ধে একটা গভীর সংশয় সবার মনে দানা বাঁধে।

বিকেল সাড়ে চারটেয় ম্যাচ। চারটের মধ্যে খালপাড় ইউথ বটতলায় হাজির হল। তারা সঙ্গে প্রায় কুড়ি জন সাপোর্টারও এনেছে। বটতলা গ্রাউণ্ডের ছিরি আজ পালটে গেছে। মাঠে পড়েছে চুনের দাগ, চার কোণে লাঠির ডগায় লাল-নীল কাগজের নিশান উড়ছে। টুকরো ইঁট বসিয়ে গোলপোস্টের বদলে, দুটো বাঁশ পুঁতে, তাতে দড়ি টাঙিয়ে বানানো হয়েছে গোল। রেফারিগিরি করার জন্য ধরে আনা হয়েছে কলেজ স্টুডেন্ট বগলাদাকে। বটতলা ক্লাবের জনা ত্রিশ সাপোর্টারও উপস্থিত।

কালো হাফ প্যান্ট, সবুজ স্পোর্টস গেঞ্জি, সাদা কেডস জুতো, লাল মোজায় সুসজ্জিত, গলায় সুতোয় ঝোলান হুইসেল, বগলাদা ঠিক চারটে পঁচিশে, দু'জন লাইনসম্যানসহ গ্রাউণ্ডে ঢুকে সজোরে বাঁশি বাজাল—ক্রু-র-র। ব্যস, দুই পক্ষের খেলোয়াড় মাঠে নেমে পড়ল।

খেলা দারুণ জমে গেল।

আক্রমণ—প্রতিআক্রমণ—উত্তেজিত দর্শকদের চিৎকার—রেফারির ঘন ঘন বংশীধ্বনি—সব মিলিয়ে হৈ হৈ কাণ্ড। আক্রমণের ভাগ খালপাড় ক্লাবেরই বেশি। খালপাড়ের স্ট্রাইকার মণ্টু অতি ডেনজারাস প্লেয়ার। সে যেমন ছোটে, তেমনি সুযোগ সন্ধানী। বটতলার স্টপার হারু তাকে ছায়ার মতো গার্ড দিতে লাগল! ভুতো কয়েকটা কিক আটকাল চমৎকার ভাবে।

হাফ টাইমের বাঁশি বাজল। তখনও খেলা ড্র। কোনো পক্ষই গোল করতে পারেনি।

হাফ টাইমের পর খেলা শুরু হতেই বটতলা এক গোল দিয়ে ফেলল। খালপাড়ের গোলের সামনে জটলার মধ্যে নিতাই আচমকা এক কিক মারতেই গোল।

খালপাড় এর পর মরিয়া হয়ে উঠল। বটতলা কোণঠাসা হয়ে

কোনও রকমে আক্রমণ ঠেকিয়ে চলল। উঃ, কী অপূর্ব যে খেলতে লাগল ভুতো। দূর থেকে, কাছ থেকে একটার পর একটা শট বটতলার গোল লক্ষ্য করে ছুটে আসে, আর ভুতো প্রত্যেকটা বাঁচিয়ে দেয়। যেন ও একা লড়ছে গোটা খালপাড়ের বিরুদ্ধে। বটতলার অনেকে মনে মনে ভাবল, এই ভুতোর নামে কিনা বিশ্বাস-ঘাতকতার অপবাদ রটিয়েছিল, ছিঃ।

খেলা প্রায় শেষ হতে চলেছে। বার বার ঘড়ি দেখছে রেফারি। এখনো জিতছে বটতলা ওই একটি গোলের ব্যবধানে। জয় প্রায় মুঠোর মধ্যে। সেই উল্লাসে বটতলা একটু আলগা দিয়ে ফেলল, এবং পরিণতি হল মারাত্মক।

মণ্টুকে ছেড়ে রেখে হাবু খানিক সরে গিয়েছিল। সেই ফাঁকে মণ্টু একটা বল পেয়ে তীব্র বেগে সোজা ছুটল বটতলার গোলের দিকে।

ভুতো একটু এগিয়ে এসে অল্প ঝুঁকে সতর্ক ভঙ্গিতে দাঁড়াল। মণ্টু কিন্তু নিজে গোলে কিক নিল না। ভুতোর ঠিক সামনে এসে, গতি একটু কমিয়ে, চট করে বাঁ পাশে আড়াআড়ি ভাবে ঠেলে দিল বল। খালপাড়ের লেফটআউট দৌড়ে আসছিল মণ্টুর পাশে পাশে। সে বল ধরল এবং এলোপাতাড়ি কিক না মেরে বল ঠেলে দিল ফাঁকা গোল লক্ষ্য করে।

ভুতো ডাইনে তাকিয়ে অসহায় দৃষ্টিতে দেখল, বল আস্তে আস্তে গড়িয়ে গোলে ঢুকছে, তার থেকে প্রায় দশ হাত দূর দিয়ে ডান গোল পোস্ট ঘেঁসে।

'গো-ও-ল', গগনভেদী গর্জন ছাড়ল খালপাড়ের সমর্থকরা।

ভুতো প্রাণপণ চেষ্টায় ডান দিকে কাত হয়ে বাড়িয়ে দিল হাত। কিন্তু হায়, বল যে তার নাগাল থেকে অনেক বাইরে।

তখুনি এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল। মাঠের সবাই স্তম্ভিত হয়ে দেখল, এক ফালি রবারকে টানলে যেমন লম্বা হয়ে বেড়ে যায়,

তেমনি ভুতোর হাত দু'খানা হঠাৎ দশ গুণ লম্বা হয়ে গিয়ে, গোল লাইন অতিক্রম করার ঠিক আগে বলটিকে আঁকড়ে ধরে সাঁত করে টেনে নিল তার বুকে। তৎক্ষণাৎ তার হাত দুটোও গুটিয়ে আগের মতো ছোট হয়ে গেল।

এই অভূতপূর্ব ঘটনার ঘোর কাটতে সবার কয়েক মুহূর্ত লেগেছিল। 'ওরে বাপ রে!' প্রথমেই রেফারি বগলাদা এক আর্তনাদ ছেড়ে মারল টেনে দৌড়। সোজা পুকুর পাড় দিয়ে ঝোপ-ঝাড় টপকে সে হাওয়া হয়ে গেল। তারপরই খালপাড় ক্লাবের খেলোয়াড়রা 'ওরে বাবারে ভূত রে, খেয়ে ফেলল রে', বলে চেঁচাতে চেঁচাতে মাঠ ছেড়ে দিল ছুট। সঙ্গে সঙ্গে বটতলার খেলোয়াড়রাও দিশাহারার মতো পালাতে লাগল। দর্শককুলও পলকে অদৃশ্য হল।

হারু নিতাই ইত্যাদি বটতলার পাঁচ ছ'জন ছেলে খালপাড়ের ছেলেদের পিছনে পিছনে দৌড়চ্ছিল ধানের খেতের ভিতর দিয়ে। সিকি মাইলটাক গিয়ে তারা থেমে পড়ল। খালপাড়ের ছেলেদের গতি অবশ্য স্তব্ধ হল না, ঊর্ধ্বশ্বাসে তারা ছুটে বেরিয়ে গেল, বোধ হয় সটান ভরতপুরে পৌঁছে থামবে।

হারুরা ফিরে তাকাল।

জনশূন্য মাঠে ভুতো একা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে বল। তার ভঙ্গিতে ও মুখের চেহারায় ভারি অপ্রস্তুত ও বিষণ্ণ ভাব। ভুতো তেড়ে আসছে না দেখে হারুরা সেখানেই দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখতে থাকে।

ভুতো একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল তাদের দিকে। তারপর সে বলটা মাটিতে নামিয়ে রেখে ধীরে ধীরে হেঁটে চলল পশ্চিম দিকে। যেতে যেতে বটগাছের নিচে পৌঁছে সে যেন চকিতে উবে গেল বাতাসে।

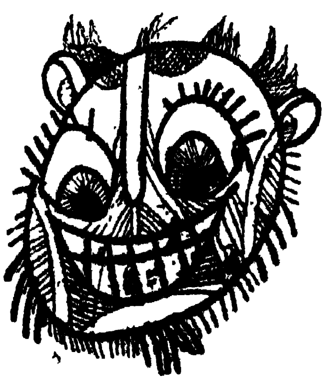
আরো ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করে বটতলার কয়েকজন অতি সাহসী

ছেলে পায়ে-পায়ে এগিয়ে মাঠে ঢুকে বলটা কুড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে এল।

এরপর কয়েকদিন বটতলা ক্লাবের সভ্যরা আর তাদের গ্রাউণ্ডের কাছে ঘেঁষেনি। তবে মাঝে মাঝে বিকেলে দূর থেকে উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখে আসত, ভুতো এসেছে কিনা।

ভুতোর দেখা না পেয়ে, দিন পনেরো পরে ছেলেরা আবার ভরসা করে বটতলার মাঠে গিয়ে খেলা শুরু করল। কাঁহাতক আর বিকেলে ফুটবল না খেলে থাকা যায়। তাদের আর কোনো গ্রাউণ্ডও নেই। প্রথম প্রথম খেলার সময় অবশ্য বেশ ভয়ে ভয়ে কাটাত, যদি ফের ভুতোর আবির্ভাব হয়? কিন্তু সে আর কখনো আসেনি।

ওই বটগাছের ছায়াঘেরা অন্ধকারে কোনও ডালে লুকিয়ে বসে, কিংবা অন্য কোথাও থেকে, ভুতো হয়তো করুণ নয়নে ছেলেদের খেলা দেখত।



টিফিনের সময় চুপিচুপি আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল,
'নতুন বউদিকে ভূতে পেয়েছে। চল্, দেখে আসবি'

ভূত

দিব্যেন্দু পালিত

ভূত নিয়ে আজ আর কেউ ভাবে না। অবস্থার চাপে বর্তমান আর ভবিষ্যৎ দুটোর রূপই এখন এমন অনিশ্চিত যে, অলস স্মৃতিচারণার মধ্যেও কেউ আর তাকে স্থান দিতে চায় না। আক্ষরিক অর্থে এ ভূত যদিও সে ভূত (অতীত) নয়, তবু বালো এর সংস্পর্শে আসেনি এমন লোকের দেখা হয়তো এখনো পাওয়া যাবে না।

ভূতের গরিমা এখন কিছুটা ম্লান। গল্পে এখনো তাদের দেখা মেলে ক্বচিৎ কখনো—অ্যাডভেঞ্চার আর ডিটেকশন যদিও প্রায়ই তাকে ঠেলে দেয় পাশে। এর জন্য যুগের যাওয়া যতোটা দায়ী, ভূত সম্পর্কে বিভিন্ন অপব্যাখ্যাও ততোটাই। ভূত চিরকালই অশ্রদ্ধার পাত্র। কথাটির অভিধানগত অর্থ 'প্রেতাত্মা', অর্থাৎ সে প্রথমে 'প্রেত' তারপরে 'আত্মা'। প্রেত আর কবে মানুষের শুভতা আকর্ষণ করেছে! আরো মুশকিল, বিভিন্ন সূত্রে ভূতের রূপ বর্ণনা কখনোই একরকম নয়—কখনো সে স্কন্ধকাটা, কখনো কঙ্কাল, কখনো বায়বীয়। এমনই যার অবস্থা, যার অস্তিত্বের কোনো নির্দিষ্ট রূপ নেই—এই যুক্তিমনস্কতার যুগে সে যে স্থায়িত্ব পাবে না, এতে আর আশ্চর্য কী!

অথচ ভূতেরও দিন ছিল। পঞ্চাশ কি একশো বছর আগেও লেখকরা ভূতকে রীতিমতো চরিত্র মনে করতেন। দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ,

দৃষ্টান্ত শেক্সপীয়ার, দৃষ্টান্ত এডগার অ্যালেন পো। তখন ভূতকে মানুষ শুধু ভয়ই পেত না, কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধাও করত। কানাই, বাসুদেব, ত্রৈলোক্য, শিবদাসের ভূতনাথদেরও কদর ছিল কিছুটা। আমার ছোটবেলার সহপাঠীদের মধ্যে অন্তত আধ ডজনের ডাক নাম ছিল 'ভূত'—ডাক নামের একাত্মতায় এরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। এখন আর কেউ শখ করে ছেলের নাম ভূত রাখেন না। তাতে প্রেস্টিজ যায়।

তবু, ভূত আর নেই, একেবারেই নেই, এমন তথ্যও বোধহয় বিশ্বাসযোগ্য নয়। ভূত নামটি চট করে না পেলেও ভূত যে এখনো কাউকে পায় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কোনো। আমার তরুণ গৃহ-ভৃত্যটি সেদিন বাজার থেকে ফিরে এসে হঠাৎই বলল, দুপুরের ট্রেনে দেশে যাবে। দেশের লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বাজারে, সেখানেই শুনেছে তার মাকে নাকি ভূতে পেয়েছে। দশটা টাকা চাইল। জয়নগর থেকে নাকি ওঝা ধরে বাড়ি যাবে।

ব্যাপারটা বোধগম্য হল না। ভূতে পাওয়ার ধরনধারণ বিষয়েও সে বলতে পারল না কিছু। শুধু এটুকু বোঝা গেল, একাদশীতে উপোস দিয়ে সন্ধ্যায় ডুব দিয়েছিল পুকুরে, সেই থেকে মা নাকি কথা বলছে না, খাচ্ছে না : শুধু হাসছে।

মন্দ কি, বলতে যাচ্ছিলাম, এই মাগগিগণ্ডার দিনে না খেয়েও যদি কেউ হাসিমুখে থাকতে পারে, তার চেয়ে ভালো আরকি হতে পারে! এমন ভূতের দেখা পেলে সরকার নিশ্চিত খেতাব দেবেন। বললুম, ভূতের দেখা পেলে ধরে আনিস সঙ্গে করে।

ভৃত্যটি চলে যেতে আমার হঠাৎ গোবিন্দর নতুন বউদির কথা মনে পড়ে গেল।

তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি। গোবিন্দ আমার সহপাঠী। টিফিনের সময় চুপিচুপি আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, 'নতুন বউদিকে ভূতে পেয়েছে। চল, দেখে আসবি।'

কৌতূহল এড়ানো গেল না। চললুম স্কুল পালিয়ে ওর সঙ্গে। মনে আছে, উত্তেজনায় সারা রাস্তা কথা ফোটেনি মুখে। একবার বোধহয় জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'হ্যাঁরে, নতুন বউদি কি এখন গাছে চড়ে আছে?'

ভারিক্কি গলায় গোবিন্দ বলল, 'না, না। ঘরেই আছে। শুয়ে থাকে বিছানায়।'

নতুন বউদির নাম সুনন্দা। গোবিন্দর দাদা অরুণ মাস দুয়েক হলো তাকে বিয়ে করে এনেছে মেদিনীপুর থেকে। খুব ধুম হয়েছিল বিয়েতে—প্রায় তিন দিন ধরে নেমন্তন্ন খেলুম আমরা, আর, বেশ ভাবও হয়ে গিয়েছিল নতুন বউদির সঙ্গে। মিশুকে, হাসি-খুশি মেয়ে। তাকে হঠাৎ ভূতে পেল! শুনলাম, একা বেলতলা দিয়ে ফিরছিল, তখনই নাকি ভূতের নিশ্বাস পড়েছে গায়ে। আমরা বেলতলাটা এড়িয়ে গেলাম।

বাগানের জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি অদ্ভুত কাণ্ড! বিছানায় শুয়ে ফুঁ দিয়ে মস্ত এক বেলুন ফোলাচ্ছে নতুন বউদি। আমরা যে দেখছি সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নেই! হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'এই ফুলি, দেখে যা এক নিশ্বাসে কতো বড় বেলুন ফুলিয়েছি! ধর্, ধর্—

শুনে ছুটে এলো গোবিন্দের মা। তাড়াতাড়ি দু'আঙুলে বেলুনের মুখটা টিপে ধরে বলল, 'খুব ভালো হয়েছে মা, খুব ভালো হয়েছে—'

গোবিন্দকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মাসিমার নাম ফুলি নাকি রে?'

'ধুস্। মার নাম বাসন্তী।' গোবিন্দ বলল, ভূতে পাওয়ার পর থেকে মাকে ফুলি ডাকছে, বাবাকে বাঁচুয়া। দাদাকে দেখলেই তো দূর হ—দূর হ করে'—

'তোকে?'

'ধুস্, আমি তো কাছেই যাই না।'

নতুন-বউদি হঠাৎ বিছানার উপর লাফিয়ে বসে বলল, 'ফুলি, বল তো আমার হাতে কী? বড় নৌকো, না ছোট নৌকো?'

শুনে আমরা দু'জনেই হাসতে শুরু করেছি। জবাব দিতে গিয়ে গোবিন্দের মার চোখ পড়ল আমাদের দিকে। দৌড় দিলুম।

ভূত ঝাড়তে দিন সাতেক পরে ওঝা ডাকা হলো। মাথায় পাগড়ী, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা আর ঝুলো গোঁফ নিয়ে সে এলো পিরপৈঁতি থেকে।

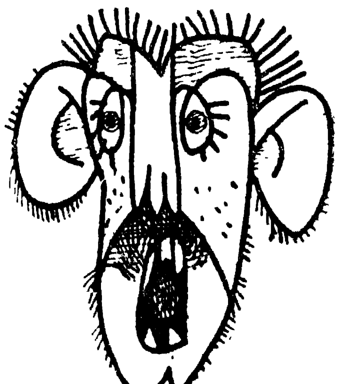
দৃশ্যটা মনে আছে এখনো। উঠোনে গোবরমাটি দিয়ে চারটে বাখারি পুঁতে সুতো জড়িয়ে গণ্ডি করা হয়েছে। মাঝখানে টুলে বসে নতুন বউদি। তার এক হাতের মুঠোয় কয়েকটা কড়ি, অন্য হাতে শুকনো কাঁকড়া বিছে। ছুটো নতুন নারকেল ঝাঁটাকে আট ভাগ করে একটা গোছা হাতে নিয়ে ওঝা মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে নতুন বউদির চারদিকে ঘোরে আর মাঝে মাঝে শব্দ করে ঝাঁটা আছড়ায় মাটিতে। মন্ত্রটা বুঝতে পারিনি, কিন্তু শুনতে অনেকটা এইরকম ছিল—

ইংড়ি বিংড়ি চারটুক্ লকৃড়ি
মার জেনানা হোঁস—
হুম্‌কা গুম্‌কা আঁধার মে লড়তা
ভূত প্রেত লক্‌ড়ি হোঁস—
হুহুম্বা হোঁস, হুহুম্বা হোঁস……'

ভূত ঝাড়া চলল ঘণ্টাখানেক। ওঝা যতোই মন্ত্র পড়ে ততোই ছটফট করে নতুন-বউদি, আর মুখটা কেমন মিইয়ে আসে। শেষে টুল ছেড়ে পালাবার চেষ্টায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটিতে। ধরাধরি করে তুলে নিয়ে গিয়ে শোয়ানো হলো খাটে। ওঝা বলল, ভূত পালিয়েছে। সাত দিনে একেবারে ভালো হয়ে যাবে।

সত্যিই ভালো হয়ে গেল নতুন বউদি। মাস আট-নয় পরে ফুটফুটে একটা বাচ্চা হলো তার। আটকৌড়িতে আর এক প্রস্থ খেয়ে এলুম আমরা।

কিন্তু ব্যাপারটা অনেকেই ভুলল না সহজে। নতুন বউদির ছেলেকে অনেকেই আড়ালে 'ভূতের বাচ্চা' বলে ডাকত।



অনেকে শুনেছে, আমিও শুনেছি, দুপুর বেলায় কি গভীর রাত্রে
শাল বনে কি এক কান্না গুমড়ে ওঠে

শাল বনের কান্না

বিজনকুমার ঘোষ

আমার বাবা যখন দেবীগঞ্জ এষ্টেটে চাকরি নিয়ে যান তখন আমার বয়স দশ কি বারো। ক্লাস সিক্স কি সেভেনে পড়ি। সে সব আজ বহুদিন আগেকার কথা। আন্দাজে ঠিক ঠিক বলতে পারব না, মনে মনেই হারিয়ে ফেলছি। তবে বছর পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ তো হবেই। কোন্ মাসে দেবীগঞ্জে এসেছিলাম, মনে পড়ে না আজ। তবে নতুন জায়গার বিচিত্র স্পর্শ-বর্ণ গন্ধ আমার মনকে ব্যাকুল করেছিল। সেই ব্যাকুলতা আজও আমার স্মৃতির ভাঁড়ারে তলানি হিসেবে পড়ে রয়েছে। সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর পরে স্মৃতি ছেঁচে আমাকে সেই সব দুঃসহ দিনগুলিকে দিনের আলোয় তুলে আনতে হচ্ছে। তাই এখানে-ওখানে সাধারণ ব্যাপারে কিছু ভুলচুক থেকে যেতে পারে। পাঠক নিজ গুণে ক্ষমা করবেন।

বেশ মনে পড়ে, দেবীগঞ্জে যখন এলাম, তখন শীতের শেষ, বসন্তের শুরু। মাঠে মাঠে প্রচুর হাওয়া ছিল, প্রচুর মিষ্টি রোদ ছিল আর ছিল পাখির কণ্ঠে অফুরন্ত গান। আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলাম দেবীগঞ্জে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে। বস্তুত এত আগুন আমরা কোথাও দেখিনি। যে দিকে তাকাই শুধু স্তূপীকৃত আগুন। আমাদের বাড়ির আশেপাশে, নদীর ধারে যাবার রাস্তায়, মাঠে মাঠে যে এত কৃষ্ণচূড়ার গাছ, আর তাতে যে এত ফুল ফুটতে পারে আমরা তা

জানতাম না। আমরা তাই অবাক হয়ে দেখতাম সারা সকাল দুপুর-সন্ধ্যা। এত সুবিধাও আমরা যে জায়গায় ছিলাম, সেখানে ছিল না। আধ মাইলের ভিতর হাই স্কুল, পাঁচ মিনিটের ভিতর হাট, দশ মিনিটের ভিতর বাজার, দেব-মন্দির, চ্যারিটেবল ডিসপেনসারী এ-সব তো ছিলই, আর ছিল পদ্মা নদী, পুকুর, মিষ্টি জলের বিল আর ঝাউগাছের শো শো শব্দ। কিন্তু এহো বাহ্য, ভাল লাগার আরও উপকরণ আমাদের জন্য মজুত ছিল। এষ্টেটের বাবুদের যতগুলি কোয়ার্টার ছিল, তার ভিতর আমাদেরটাই সর্বোত্তম, পজিসন সবচেয়ে ভাল তবে আশ্চর্যের বিষয় আমাদের জন্যেই নাকি কোয়ার্টারটা চার বছর ধরে খালি পড়ে ছিল। অন্য বাজে কোয়ার্টারে সবাই গিয়েছে, তবু এখানে কেউ আসতে চায়নি। ছবির মত এমন সুন্দর কোয়ার্টারে ঢুকতে ঢুকতে তাই মনে করলাম, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের অসীম করুণা। নাহলে কিছুতেই সম্ভব হত না।

কিন্তু বিস্ময়ের তখনো শেষ হয় নি। দক্ষিণ দিকের জানলাগুলি খুলে দিয়ে বাবা আমাদের ডাক দিলেন। তার গলার স্বর তখন কাঁপছিল। আমরা অবাক হয়ে গেলাম জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে। আমাদের প্রত্যেকের মুখ দিয়ে একসঙ্গে 'আঃ' শব্দ বেরিয়ে এল। সমুদ্রের মত সবুজ যেন আকাশের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। সত্যি, এমন ঘন শালের বন আমরা কোথাও দেখিনি। আমাদের বাড়ি থেকে আধ মাইল দূরে বনটা। বসন্তের শুরুতে সবুজ পাতার নেশায় মাতাল হয়ে উঠেছে। কি সুন্দরই না দেখতে! শাল বনের পরেই পদ্মা নদী। সারা দিন এলোমেলো হাওয়া উড়ত সেখানে। আমরা বই ফেলে উদাস হয়ে সেই দিকে তাকিয়ে থাকতাম সত্যি, শালবন আস্তে আস্তে আমাদের সমগ্র সত্তাটিকে এমনভাবে গ্রাস করতে আরম্ভ করল যে, আমরা পাগল হয়ে যেতে লাগলাম দিন দিন। পড়াশুনা ফেলে সময় নষ্ট করার জন্যে বাবা মাঝে

মাঝে বকেন, জানলাগুলি বন্ধ করতে যান, কিন্তু বন্ধ করা আর হয় না। অবাক হয়ে তিনিও তাকিয়ে থাকেন। শালের বনে তখন ঘুঘু পাখির ডাক। বাবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ শোনেন, তারপর জামার বোতাম লাগাতে লাগাতে অফিসে চলে যান।

এর কিছু দিন পর নববর্ষ। পাড়া গাঁ হলেও তখনকার দিনে দেবীগঞ্জে রীতিমত উৎসব পড়ে যেত পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে। ডাক্তারখানার মাঠে মেলা বসত। অনেক দূর থেকে দোকান-পশরা আসত। দেবীগঞ্জ তখন মুহুর্মুহু বাঘের গর্জনে চমকিত। আমরা নাওয়া-খাওয়া ফেলে বাঘের খাঁচার চারপাশে ঘুর ঘুর করতাম। সুযোগ পেলে সার্কাসওলা এদিক ওদিক গেলে কাঠি দিয়ে খোঁচা দিতাম। আর কি গর্জন! সেবার আমরা যখন ডাক্তারখানার মাঠে এই কাজে নিয়োজিত, বাবা হঠাৎ পিছন দিক থেকে ডাক দিলেন। আমরা গুটি গুটি ঘরে ফিরে এলাম। পাশের গ্রাম কল্যাণপুর থেকে আচার্যমশাই এসেছেন। তিনি আমাদের বর্ষফল শোনাবেন। এষ্টেটপাড়ায় প্রতি বছরই তিনি আসেন। কোষ্ঠি-ঠিকুজিও তৈরি করে থাকেন। এবার বছরটা নাকি খুব খারাপ যাবে, দুই গুণ আয়, তিন-গুণ ব্যয়, শূন্য স্থিতি। বর্ষফল শোনান শেষ হলে আচার্যমশাই হঠাৎ বলে উঠলেন, এষ্টেট পাড়ায় এত বাড়ি থাকতে শেষকালে এই বাড়িটা পছন্দ করলেন?

বাবা উত্তর দিলেন, আমার ভাগ্য।

—আপনার দুর্ভাগ্য। বাবার চোখে চোখে তাকালেন আচর্যমশাই: আর যাই করুন, কাজটা ভাল করেন নি ঘোষ মশাই। বাড়িটার বদনাম আছে।

বাবা বললেন, আমি কোন কুসংস্কার মানিনে।

—ভাল কথা, খুব ভাল কথা। মানবেন কেন? আপনারা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত। তবে কিনা একটা গল্প—

—থাক। ও গল্প শুনিয়ে ছেলে-মেয়েদের ভীতু করবেন না। আমরা বেশ আছি এই বাড়িতে।

কিন্তু আমরা ততক্ষণে অজানা রহস্যের সন্ধান পেয়ে গেছি। শাল বনের হাওয়ার মত উতলা হয়েছি সঙ্গে সঙ্গে। সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলাম, বলতেই হবে গল্প, কিছুতেই শুনব না। না-না, বলতেই হবে—

আচার্যমশাই হাসেন, তোদের বাবাকে জিজ্ঞেস কর। আমাকে কেন ?

আমরা বাবাকে তখুনি ধরে পড়লাম।

—একটুও ভীতু হব না বাবা, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। আমরা আগের মতই সাহসী থাকব।

বাবা এবার হেসে ফেললেন। আচার্যমশাই বললেন, এটা সাধারণ গল্প ঘোষমশাই। সবাই জানে। ভয় পাবার মত কিছু নেই এতে।

—তাহলে বলুন।

আমার উৎকর্ণ। বাবাও একটা চেয়ার টেনে বসলেন।

গল্প বলতে গিয়ে আচার্যমশাই হঠাৎ জানলার দিকে তাকালেন। খানিকক্ষণ চেয়েই রইলেন সেদিকে। শালের বনে বনে তখন নতুন বছরের প্রথম আলো পড়েছিল। কচি পাতাগুলকে আরো সবুজ, আরো উজ্জ্বল হয়ে, কি অপরূপই না দেখাচ্ছিল! আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ। সেই জন্যে বুঝি ঈষৎ বাতাস উঠেছিল শাল বনের ভিতর।

আচার্যমশাই গলা খাঁকারি দিলেন। তারপর শুরু করলেন, ভয় পাবার কিছু নেই ঘোষমশাই। বাংলাদেশে আগে আগে হামেশাই এ-রকম গল্প শোনা যেত। ইংরেজদের শাসনে এখন তো অনেক কমেছে।

—ডাকাতের গল্প বলছেন তো ?—বাবা বললেন।

—হ্যাঁ। ওই যে শালের বন দেখছেন, বহুকাল আগে ওখানে একদল ভয়ঙ্কর ডাকাতের আস্তানা ছিল। সাঙ্গোপাঙ্গো আরো অনেক ছিল, কিন্তু লীডার ছিল তিনজন। পদ্মা নদী দিয়ে যত বড় বড় নৌকো যেত, আসে-পাশে যত বড়লোক ছিল, জোতদার ছিল, জমিদারের খাজনা ইত্যাদি লুঠ করাই ছিল ওদের পেশা। সব জায়গাতেই যে সহজভাবেই এসব হত, তা নয়। বাধা পেত নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে; কিন্তু মানুষ খুন করা ওদের কাছে কচুগাছ কাটার মতই সহজ। আতঙ্কে তখনকার দিনে এ সব অঞ্চলে সন্ধ্যের পর কেউ বেরোত না। ওই যে শালের বন, আগে আরো অনেক ঘন, আরো বিশাল ছিল। এখন তো অনেক জমি বের করে নেওয়া হয়েছে। তখন ওই বনে কাঠুরেরা কাঠ কাটতে যেত, বুনোরা টিয়াপাখির ছানা ধরতে যেত। কিন্তু ওরাই বুঝতে পারেনি যে, এই বনের ভিতরেই সেই বিখ্যাত দলটি বাস করে। দিনের বেলায় গভীর জঙ্গলের ভিতর ডাকাতেরা ঘুমোত, রাত্রিবেলা অভিসারে বেরোত।

এই পর্যন্ত বলে আচার্য মশাই থামলেন। আমাদের ওপর দিয়ে বন-কবুতরের ঝাঁক নদীর দিকে উড়ে গেল। বাবা একবার হাতঘড়িটার দিকে তাকালেন। আচার্যমশাই বলতে লাগলেন, একবার ডাকাতেরা কোথা এক সুন্দর ছেলে বিক্রির জন্যে অপহরণ করে আনে। এতদিন টাকা পয়সার ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে কোন বিবাদ বাধেনি, কিন্তু এবার তার সূত্রপাত হল। তিনজন নেতাই এক সঙ্গে দাবী করে বসল টাকার ভাগ ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু ছেলেটি আমার চাই। কেউ কারো থেকে কম যায় না। সাধারণত এক্ষেত্রে যা হয়, আশ্চর্যের বিষয় এখানে তা হল না। জোর যার মুল্লুক তার একথা কেউ বলল না। একদিন কাঠুরেরা গভীর জঙ্গলের ভিতর তিনটি গলিত দেহ আবিষ্কার করল। তিনটি দেহ গাছের ডালে ঝুলে রয়েছে। কি বীভৎস মূর্তি

দুর্গন্ধে রাজ্যের মাছি উড়ে বেড়াচ্ছে ভন ভন করে। তিন চারদিনের বাসি মরা। বিষ পিঁপড়ের সারি মাংসের লোভে গাছ বেয়ে উঠছে। শকুনেরা বলে খেয়েছে। ফাঁসি নিয়েছে ওরা। ব্যাপারটা জানাজানি হতেই পুলিশ এল। সাঙ্গোপাঙ্গোদের কয়েকজন ধরা পড়ল। ছোটখাট একটা কালীমন্দির আবিষ্কার হল বনের ভিতর। কিন্তু ছেলেটির কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। যার জন্য এত কাণ্ড সেই যেন মিলিয়ে গেল ভোজবাজির মত। শেষে ব্যাপারটা ওখানেই চাপা পড়ল। কিন্তু লোকে বলতে লাগল সুন্দর ছেলেটির আত্মা নাকি নির্জন শাল বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। অনেকে শুনেছে, আমিও শুনেছি, দুপুর বেলায়, কি গভীর রাত্রে শাল বনে কি এক কান্না গুমড়ে ওঠে। করুণ সুরে আকর্ষণের ইন্দ্রজাল ছড়ায়।

বলতে বলতে আচার্য মশাই উঠে দাঁড়ালেন। দৃষ্টির আড়ালে তার দেহটা মুছে যেতেই বাবা সশব্দে হেসে উঠলেন। সে হাসি আজো আমার কানে লেগে রয়েছে।

মাস ছয়েক পরের কথা।

পেনসন নিয়ে বার্মা থেকে এই সময় আমার দাদামশায় এলেন দেবীগঞ্জে। তিনি বার্মার রেলওয়ে বিভাগে ডিভিসনাল ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। বহু নতুন নতুন রেলপথ তারই অধীনে তৈরি হয়েছে এবং এই কাজে বিস্তর প্রশংসা অর্জন করেছিলেন বার্মা সরকারের কাছ থেকে। আজো রেঙ্গুণের পুরনো বাঙালী মহলে তাঁর নাম ডাক আছে।

বেশ মনে পড়ে, সকাল থেকে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে, কখনো জোরে কখনো আস্তে। আকাশময় মেঘেরা বুনো মোষের মত দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। বারোয়ারীতলায় মহাষ্টমী পুজো আরম্ভ হয়ে গেছে। থেকে থেকে ঢাকের আওয়াজ আসছে কানে। কিন্তু এমন দিনে আমাদের বেরোবার হুকুম হয়নি। তাই নতুন জামা কাপড় পরে অত্যন্ত দুঃখিত মনে আমরা বারান্দায় বসেছিলাম। এমন সময়

একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে দরজার সামনে দাঁড়াল। একজন সাহেবী পোষাক পরা ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নামলেন। দাদামশায়কে এর আগে আমরা দেখিনি। দিদিমণি অনেকদিন আগেই মারা গেছেন। মা-ই তার একমাত্র সন্তান। দীর্ঘদিন কর্মোপলক্ষে ব্রহ্মের জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তাই মেয়ের কাছে বিশ্রাম নিতে এসেছেন। তার বিশ্বাস, দেবীগঞ্জে তিনি শান্তি পাবেন। বিস্কুট, চকোলেটের ঘুষ ছড়িয়ে সহজেই আমাদের মন জয় করে নিলেন। সাহেব বলে একটুও ভয় পেলাম না। আমাদের কোয়ার্টার দেখে খুশিও হলেন। কিন্তু সবচেয়ে অবাক হলেন দক্ষিণ দিকের জানলা খুলে। কালো মেঘের তলে নধর সবুজ উদ্বেল হয়ে উঠেছিল তখন বাতাসে। মুগ্ধ শিশুর দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন দাদামশায়। টেবিলে চা তার জুড়িয়ে যাচ্ছিল। মাকে বললেন আনু, এমন সুন্দর জিনিষ যে তোদের এখানে আছে তা তো একবারও চিঠিতে লিখিস নি।

শালের বন যে সুন্দর, তা তোমাদের চোখেই লাগছে বাবা। আমার ভয় করে।

বাবা বললেন, এখানকার আচার্যমশাই এক গল্প শুনিয়ে গেছেন। কার যেন আত্মা শাল বনে ঘুরে বেড়ায়, কাঁদে, সেই থেকে ভয় পেয়েছে।

দাদামশায় খুব জোরে হেসে উঠলেন।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম করলেন। বিকেলে মেঘ কেটে গেল। বললেন, হ্যাঁরে, তোরা শালবনে কেউ গিয়েছিস?

আমরা বললাম, না মা যেতে দেয় না।

—চল, তোদের দেখিয়ে আনি। দাদামশায় বললেন।

হাঁটতে হাঁটতে এলাম। কিন্তু কাছে এসে আমাদের ততটা ভাল লাগল না। যতটা জানালা থেকে মনে হত। তার ওপর আজ অষ্টমীর পুজো, বারোয়ারী তলায় থিয়েটার হবে। নতুন জামা-

কাপড় কাউকে দেখাতে পারছি না, সে জন্যে মনে যথেষ্ট ক্ষোভ। কিন্তু দাদামশায়ের যেন শালের বন দেখা শেষ হয় না। বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় জল জমেছে। পাতা থেকে জল ঝরে ঝরে আমাদের নতুন জামাগুলি ভিজিয়ে দিচ্ছে। শেষে আমাদের সমবেত আপত্তিতে দাদামশায়কে ফিরতে হল।

এরপর থেকে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। দাদামশায় কিছুতেই ঘরে থাকতে চান না। বাবা কত বলেন, মা কত অনুযোগ করেন, কিন্তু দাদামশায়ের ওই এক গোঁ, শালবন নাকি তাঁকে ডাকে। মানুষের ভাষায় কথা বলে। বলেন, যতই তোরা খাওয়াস, যত্ন করিস, আমার স্বাস্থ্য কিছুতেই ভাল হবে না যতক্ষণ না শাল সেগুনের হাওয়া গায়ে লাগে।

দাদামশায় বহুদিন বার্মায় ছিলেন। বার্মার বিখ্যাত শাল সেগুনের জঙ্গল সাফ করে নতুন নতুন রেলপথ পাততে হয়েছিল সে সময়। তাই তাঁকেও সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হয়েছিল। সেই জন্যে বুঝি জঙ্গলের মায়ায় পড়ে গেছেন। বাবা এই রকম ব্যাখ্যা করতেন। কিন্তু মার সন্দেহ দূর হত না। মাঝে মাঝে তিনিও নাকি শাল বনে কান্না শুনেছেন। আগে আগে বাবা আমাদের ভুল ভাঙাবার জন্য হঠাৎ ঘুম ভাঙাতেন। সত্যিই, মাঝ রাতে শাল বনে কিসের এক গোঙানি শুনতাম আমরাও। এই সময়ে আচার্য মশায়ের গল্প মনে পড়ে যেত, সত্যিই গাটা অকারণে ছুন ছুম করত। জানালা খুলে ভয়ে ভয়ে লক্ষ্য করতাম, কেমন এক শীতল জ্যোৎস্নার চাদর শাল বনের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। বনের ভিতরে ভারী আলোড়ন চলছে। আর বাঁশীর মত করুণ সুর থেকে থেকে সেখান থেকে বেরোচ্ছে। বাবা বলতেন, নির্জন রাত্রিতে পদ্মার হাওয়া বনের মধ্যে ঢোকে, বেরোবার পথ পায় না, ঘুরপাক খায়, তাতে ওই রকম কান্নার মত সুর ওঠে। লোকের ভুল বুঝবার এটাই হল আসল কারণ।

কিন্তু সে যাক, দাদু এখন কেমন যেন হয়ে গেছেন। ভাল করে আমাদের সঙ্গে কথা বলেন না। অত্যন্ত গম্ভীর। আকাশ থেকে একখণ্ড মেঘ যেন তার মুখে ছিটকে পড়েছে। সেই মেঘ এত কালো যে উড়ে যাবার শক্তি পর্যন্ত নেই। খাইয়ে মানুন ছিলেন বার্মায় থাকতে, এখন একদম খেতে পারেন না। ইংরেজী বই পড়ার অভ্যাসটা তার অবশ্য এখনো যায়নি। ভোর বেলায় একটা বই হাতে শাল বনে চলে যান। ঘন ঘাসের ওপর বসে পড়েন। এ সময় নাওয়া-খাওয়া পর্যন্ত ভুল হয়ে যায়। চাকর পাঠিয়ে বার বার ডাকতে হয়। আবার খাওয়া-দাওয়ার পরেই অস্থির হয়ে ওঠেন যাবার জন্যে। কান্নার গল্প না হয় না মানুন, কু-সংস্কার উড়িয়ে দিন, তবু সাপ-খোপের ভয় তো মানুষের আছে। মা মিছেই উতলা হন। বাবা বোঝাতে গিয়ে ব্যর্থ হন। কোন ফল হয় না।

এইবার সেই দিনটির কথা বলে আমি শেষ করব।

কি ভয়ংকর সেই দিন। আমার স্পষ্ট মনে আছে। আজো যখন ভাবি আমার সমস্ত গা শিউরে ওঠে।

মাঘ মাসের দিন সে সময়। পদ্মাপারের গ্রামগুলিতে ভয়ংকর শীত পড়েছে। তার ওপর ঝোড়ো-হাওয়া। আমাদের বাড়িতে লোকজনের দ্রুত আসা-যাওয়া। গম্ভীর থমথমে চারদিক। একটা ভয়ংকর দৃশ্যের প্রস্তুতি হিসেবে বাতাস যেন চঞ্চল হয়েছে আরো। আমাদের গায়ে ধারাল অস্ত্রের মত কেটে বসছে। সকাল থেকে দাদা মশায়কে পাওয়া যাচ্ছে না। শালবনের আসে পাশে সবাই খুঁজে এসেছে। কিন্তু কেউ বনের গভীরে যেতে সাহস করছে না এই রাত্রিবেলায়। কিন্তু দিনের অপেক্ষায় বসে থাকবার পাত্র বাবা নন। একাই টর্চ হাতে বেরিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে তিনিও ফিরে এলেন রাত্রির মত মুখ নিয়ে।

ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম আমরা সে রাতে।

মা কাঁদছিলেন। এই অভিশপ্ত বাড়ি ছাড়বার জন্যে অস্থির হয়েছিলেন। আমরা সারা রাত জেগে ছিলাম। সহৃদয় প্রতিবেশীরা সমস্ত রাত জেগে আমাদের সাহস দিয়েছিলেন। রাত যেন কাটতে চাইছিল না কিছুতে। ভয়ের চাবুক বার বার আছড়ে পড়ছিল সারা দেহে।

অবশেষে ভোর হল।

শাল বনের হৃদ্‌পিণ্ড থেকে দাদামশায়ের প্রাণহীন দেহটা বের করে নিয়ে আসা হল।

খবর পেয়ে আচার্যমশায় এলেন। বললেন, এই কোয়ার্টারে যারা এসেছে, দেখেছি, একজনকে শালবনে রেখে যেতে হয়েছে। তখন বলিনি ছেলেরা ভয় পাবে বলে! কিন্তু ম্যানেজারের উচিত ছিল আপনাকে পরিষ্কার করে বলা। কেউ থাকতে চায় না এখানে। আজই এই বাড়িটা বদলান।

বদলাবার আর দরকার হয়নি। সেদিনই সন্ধ্যের গাড়িতে দেবীগঞ্জ ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম। বাবা চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে দিন তিনেক পরে আমাদের কাছে এসেছিলেন।

কিন্তু এতদিন পর, আজো আমার মনে এক রহস্য খেলা করে বেড়ায়। দাদামশায় সাহেব মানুষ, কিসের নেশায় তবে আত্মহত্যা করতে গেলেন? তিনি কি জানেন না, গভীর রাতে পদ্মার বাতাস বনের মধ্যে পথ না পেলে ওই রকম কান্নার মত সুর বেরোয়? অথবা এসব ছাড়া আর কোন অর্থ পেয়েছিলেন কি এর ভিতর?

এর কিছুদিন বাদেই কলকাতা শহরেই আমার জীবনে এমন একটা অভিজ্ঞতা হলো, যার ঠিক ব্যাখ্যা আমি আজও জানি না।

দরজার আড়ালে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আমি কোনোদিন ভূত দেখিনি। কিন্তু আমার খুব ইচ্ছে, কখনো একটা ভূতের সঙ্গে সামনা-সামনি কথা বলি।

ছেলেবেলা থেকে কত ভূতের গল্প পড়েছি, লোকের মুখে গল্পও শুনেছি অনেক রকম। আমার খুব দুঃখ হতো, এতো লোক ভূত দেখতে পায় অথচ আমার ভাগ্যে আজও একটা ভদ্রমতন ভূত জুটলো না।

শহরের চেয়ে গ্রামেই বেশি ভূত থাকে। আমি গ্রামে গেছি অনেকবার। কাটিয়েছিও বহুদিন। কিন্তু হায়, কোনোদিন একটাও ভূত চোখে পড়েনি। অন্ধকার মাঠের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় কখনো দু'একবার মনে হয়েছে বটে যে দূরে ঘোমটা মাথায় একটি পেত্নি দাঁড়িয়ে আছে, বুক একটু একটু কেঁপে উঠেছে ভয়ে কিন্তু কাছে গিয়ে দেখেছি, কিছুই না একটা কলা গাছ।

বন্ধুদের সঙ্গে একবার বেহালার একটা বাগানবাড়িতেও রাত কাটিয়ে এসেছিলাম। সেই বাগান বাড়িটার বেশ সুনাম ছিল ভূতের হিসেবে, অনেকেই দেখেছে, প্রায় কেউ নাকি বিফল হয়নি। কিন্তু আমরা সারারাত জেগে বসে রইলাম, তাস খেললাম, অন্ধকারে বাগানে ঘুরলাম, কিছুই হলো না। ভূতেরা আমাদের বয়কট করেছিল।

একমাত্র সে বাড়ির ছাদে দেখেছিলাম একটা ভূতুম প্যাঁচা। আমাদের অবস্থা যেন বাঘ শিকার করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বাজার থেকে খরগোশ কিনে ফিরে আসার মতন।

এই রকম অবস্থায় আমার পক্ষে ভূত সম্পর্কে অবিশ্বাসী হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। এত চেষ্টা করেও যদি ভূতের দেখা না পাই, তা হলে ভূতদের আমিই বা কেন পাত্তা দিতে যাবো। অর্থাৎ আমি যেমন ভূতে বিশ্বাস করি না, তেমনি ভূতেরাও আমাকে বিশ্বাস করে না। ভূতেরাও আমাকে কখনো দেখেনি, সুতরাং আমাকেই বা তারা বিশ্বাস করবে কি করে।

এ সত্ত্বেও অবশ্য ইংরেজি বাংলা ভূতের গল্প পড়তে আমার খুবই ভালো লাগে। মাঝ রাত্তিরে একা থাকলে কখনো কখনো যে একটু আধটু গা ছমছম করে না তাও না। কিন্তু লোকজনের সামনে আমি জোর গলায় ভূতের মুণ্ডপাত করি।

গত বছরেই আমি বীরভূমের একটা গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমার বন্ধু তপেন সেখানে একটি নতুন প্রতিষ্ঠিত কলেজে চাকরি পেয়েছে। কয়েকদিন খুব খাওয়া দাওয়া আর আড্ডা হলো। তপেন বললো, এখানকার শ্মশানে কিন্তু রাত্তির বেলা কেউ যায় না।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম, কেন ?

কি জানি সবাই ভয় পায়। এখানে রাত্তির বেলা কেউ মারা গেলেও সকালের আগে পোড়াতে নিয়ে যায় না। বহুদিন ধরে এই নিয়ম চলে আসছে।

আমি তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে বললুম, চল, শ্মশানটা ঘুরে আসা যাক্।

তপেন বললে, ধ্যাৎ। এ সব পাগলামি করার কোনো মানে হয় না।

তপনকে আমি সাহসী ছেলে বলেই জানতুম। গ্রামে এসে ভীতু হয়ে গেছে। কিছুতেই শ্মশানে যেতে চায় না। তখন আমার মধ্যে

একটা বাহাদুরি দেখাবার লোভ এসে গেছে। আমি যাবোই বলে গোঁ ধরলাম।

তপেন আমার হাত ধরে টানাটানি করতে লাগলো। বারবার বলতে লাগলো, কেন পাগলামি করছিস্। তোর একটা কিছু বিপদ হয়ে গেলে তোর স্ত্রীর কাছে আমি কি করে মুখ দেখাবো, বলতো ?

আমি বললাম, আমার স্ত্রী তোর মুখ দেখার জন্য ব্যাকুল এমন তো মনে হয় না।

গ্রামের রাস্তা ধরে তপেন অনেকখানি আমার সঙ্গে এলো। দূরে যখন শ্মশানটা দেখা যাচ্ছে তখনও তপেন একবার আমার হাত ধরে মিনতি করে বললো, সুনীল, প্লীজ যাসনি, আমার অনুরোধ রাখ।

আমি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, তুই এখানে দাঁড়িয়ে থাক্, আমি এখুনি ফিরে আসছি।

তপেন শেষ পর্যন্ত বললো, চল, আমিও যাই, যা হবার দু'জনেরই হবে।

আমি তপেনকে যেতে দিলাম না। একা একা সাহস দেখাবার লোভ ছাড়ছিলাম না।

গ্রামের শ্মশান সাধারণত নদীর ধারে হয়। বীরভূমের অনেক শ্মশানে তান্ত্রিকরা সাধনা করেন শুনেছি। এই শ্মশানটাও নদীর ধারে। তবে খুবই ছোট নদী। এখন শুকনো। একটা বিশাল বটগাছের নিচে ঝুপসি অন্ধকার।

শ্মশানটার একেবারে কাছাকাছি এসে মনে হলো, ইস্ একটা টর্চ আনলে হতো। জায়গাটা বড় বেশি অন্ধকার আর দারুণ নির্জন। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে শুধু। বহুদূরের একটা কুকুরের অশ্রান্ত চিৎকার।

আমার চলার গতি কমে এলো। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম তপেনকে আর দেখা যাচ্ছে না। একটা ভাঙা কলসীর ওপর পা পড়তেই আমি ভয়ে লাফিয়ে উঠলাম।

পরক্ষণেই নিজেকে ধিক্কার দিলাম, একি, আমি ভয় পাচ্ছি কেন? কিসের ভয়?

ভয় কাটাবার জন্য খালি ফস্ করে একটা সিগারেট ধরালাম। তবু মনে জোর এলো না। মনে হতে লাগলো, ভূত না থাক, সাপ-টাপ তো থাকতে পারে। টর্চ আনা উচিত ছিল।

সিগারেটের সামান্য আলোয় কিছুই দেখা যায় না। একটা একটা করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালতে লাগলাম। কিছু পোড়া কাঠ কয়েকটা ভাঙা হাড়ি আর একটা ছেঁড়া মাদুর ছাড়া কিছুই নেই। এখানে লোকে রাত্রে আসতে ভয় পায় কেন? কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই না।

ঠিক এই কথাটা চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা ঘটঘটাং আওয়াজ পেলাম। একটা মাটির হাঁড়ি যেন গড়াচ্ছে। চমকে ডান দিকে তাকাতেই দেখলাম দুটো জ্বলজ্বলে চোখ আর কি একটা বীভৎস প্রাণী এগিয়ে আসছে আমার দিকে।

নিজের কাছে তো স্বীকার করতে লজ্জা নেই। সেই মুহূর্তে আমি অসম্ভব ভয় পেয়েছিলাম। আমার গলা শুকিয়ে গেল। পা কাঁপতে লাগলো। না জীবনে আর কোনদিন আমি হাঁটতে পারবো না, কথাও বলতে পারবো না।

তখুনি দূর থেকে তপেন ডেকে উঠলো, সুনীল, সুনীল। সেই ডাকে সম্বিত ফিরে পেয়ে আমি দৌড়োলাম। দৌড়োতে গিয়েই এক আছাড়!

সেদিন যদি আছাড় খেয়ে না পড়তাম, তা হলে সারাজীবন আমাকে ভীতুই থাকতে হতো।

আমি আছাড় খেয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে একটা নেড়ি কুত্তা কেঁউ কেঁউ করে ডেকে ছুটে পালালো। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার মতন আমার শরীর থেকে ভয় চলে গেল একেবারে। আর কিছুই না, একটা ক্ষুধার্ত কুকুর মাটির হাঁড়ি চাটছিল। বহুদিনের

কুসংস্কার অন্ধকার আর নির্জনতার জন্য সেটাকেই আমার মনে হয়েছিল অদ্ভুত কিছু! ভালো করে তাকাতে পর্যন্ত পারিনি।

আমি হো হো করে হেসে উঠলাম। বিশেষত তপেনকে শোনাবার জন্যই আমার হাসি ক্রমশ আরোও জোরালো হয়ে উঠতে লাগলো।

তপেন হাঁপাতে হাঁপাতে এসে জিজ্ঞেস করলো, কি, কি হয়েছে? আমি বললাম, কিছু না। এবারও ভূতেরা আমাকে ভয় পেয়েছে।

যাই হোক এইভাবে আমি বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলের মধ্যে ধারনটা তৈরি করে দিতে পেরেছিলাম যে আমি ভূত একেবারে বিশ্বাস করি না। ভূত টুত আমার ধার ঘেঁষে না কখনো।

কিন্তু এর কিছুদিন বাদেই কলকাতা শহরেই আমার জীবনে এমন একটা অভিজ্ঞতা হলো, যার ঠিক ব্যাখ্যা আমি আজও জানি না। ভূত আমি আজও দেখিনি। তবে আমার ঘরের দরজার আড়ালে কে এসেছিল, কে জানে?

ব্যাপারটা গোড়া থেকেই বলতে হয়।

বিয়ে করার পর আমি একটা সার সত্য জানলাম! মেয়েদের খুশি করতে গেলে একটা ভালো বাথরুমওয়ালা বাড়িতে থাকা দরকার। বিয়ের পর মেয়েদের কাছে স্বামীর যৌবন, কিংবা পৌরুষ কিংবা টাকা পয়সা কিংবা খ্যাতি সবই তুচ্ছ হয়ে যায়, যদি বাড়ির বাথরুমটা ভালো না হয়। আমার স্ত্রী শান্তার স্নান করতে সময় লাগে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট। স্নানের ঘরটা তার একটা বিলাসিতার জায়গা, সুতরাং আমি যে ফ্ল্যাট ভাড়া করি, বাথরুমটা কিছুতেই তার মনের মত হয়না। ফলে আমাদের গৃহ শান্তি নষ্ট হবার উপক্রম, এইজন্য আমাকে ঘন ঘন বাড়ি বদলাতে হয়।

কলকাতা শহরে পছন্দ মতন ফ্ল্যাট খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর তাছাড়া প্রত্যেকবার নতুন ফ্ল্যাট নিতে গেলেই ভাড়া বেড়ে যায়— কিন্তু এসব কথা শান্তাকে বোঝানো যাবে না। বাড়িতে ফিরে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করার বদলে ফ্ল্যাট খুঁজে বেড়ানো অনেক উত্তম কাজ।

তিন চারবার বাড়ি বদলাবার পর দক্ষিণ কলকাতায় লেকের ধারে আমরা একটা চমৎকার ফ্ল্যাট পেয়ে গেলাম। ছিমছাম, ছোটো খাটো এবং পরিস্কার, ঠিক যেন আমাদের জন্যই তৈরি ভাড়াও সাধ্যের মধ্যে, দুটি বাথরুম। একটা একটু সাধারণ গোছের হলেও, শোবার ঘরের সঙ্গে লাগানো বাথরুমটি এককথায় অনবদ্য। রীতিমত বড়, সাদা টালি বসানো, ধপধপে চকচকে। বাথরুমের জানলা দিয়ে দূরের মাঠ ও গাছপালা দেখা যায়।

শান্তার দারুণ পছন্দ হয়ে গেল। পরের রবিবারেই আমরা বাড়ি বদল করে ফেললাম।

নতুন বাড়িতে এসে একদিন আমি আমার বন্ধু-বান্ধবীদের নিমন্ত্রণ করলাম! রীতিমতন হৈ চৈ আনন্দে কাটলো কয়েকটা দিন। শান্তার সবসময় মন ভালো থাকে। আমি একটু বেশি রাত করে বাড়ি ফিরলেও বকুনি দেয়না। বুঝতে পারি সবই যেন ঐ বাথরুমের গুণ। শান্তা এখন স্নানের সময়টা বাড়িয়ে এক ঘণ্টা করেছে। শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে ও দু'তিনটি রবীন্দ্র-সঙ্গীত শেষ করে।

প্রথম ঘটনাটি ঘটলো দিন আষ্টেক বাদে। আমরা ঘুমোই অনেক রাত করে। প্রায় সারা শহর ঘুমিয়ে পড়ার পর। একবার ঘুমিয়ে পড়লে সহজে আমার ঘুম ভাঙে না।

আমি অঘোরে ঘুমোচ্ছিলাম।

হঠাৎ শান্তা আমাকে ঠেলা দিয়ে বলল, এই এই, শুনছো?

বেশ কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর আমার ঘুম ভাঙলো। ঘুম জড়িত গলায় আমি বললাম, কি ?

কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে ?

—এত রাত্রে আবার কে দরজায় ধাক্কা দেবে ? ও কিছু না। ঘুমোওনি এখনো ?

—ঐতো আওয়াজ হচ্ছে, তুমি শুনতে পাচ্ছো না ? আমি কান পেতে শুনলাম। হ্যাঁ একটা আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে বটে। খুব জোরে নয়। কেউ যেন খানিকটা দ্বিধা ও সঙ্কোচের সঙ্গে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে, যাতে প্রতিবেশীদের ঘুম না ভাঙে।

আমি শুয়ে শুয়েই জিজ্ঞেস করলাম, কে ?

আওয়াজটা থেমে গেল।

আমি বললাম, হাওয়ায় ধাক্কা লাগছিল বোধ হয়। কিছু না, ঘুমোও।

শান্তা বললো, মোটেই হাওয়ার ধাক্কায় ও রকম শব্দ হয়না।

স্বামী হিসেবে এবার উঠে দেখা উচিত। নইলে শান্তা আমাকে ভীতু ভাববে। কিন্তু শীতের রাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠতে কার ইচ্ছে হয়।

তবু উঠতে হলো। আলো জ্বাললাম। দরজা খুলে দেখলাম বাইরে কেউ নেই। বাইরের আলো জ্বেলে সদর দরজাও খুলে দেখলাম, সিঁড়িতে উঁকি দিলাম, কোথাও কেউ নেই।

আমি একটু অসামাজিক ধরণের মানুষ। বহুদিন অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে ঘোরাঘুরি করি। আমার বন্ধুরাও কখনো কখনো মাঝ রাত্তিরে এসে আমার বাড়তে হাজির হয়। সেই রকম কেউ এসে দরজায় ধাক্কা দিলে অবাক হবার কিছু ছিল না।

কিন্তু কারুকে কোথাও দেখতে না পেয়ে আমাকে এই সিদ্ধান্ত নিতেই হলো যে হাওয়ায় ধাক্কা লেগেছে কিংবা ইঁদুর-টিদুর খট্‌খট্‌ করছিল। ফ্ল্যাটের মধ্যে ইঁদুর থাকা ভালো কথা নয়। শান্তা

ইঁদুর দেখলে খাটের ওপরে লাফিয়ে ওঠে। কাল সকালে এর একটা কিছু করতে হবে। আলো-টালো নিবিয়ে আবার ফিরে এলাম। শান্তাকে একটু মৃদু বকুনি দিয়ে বললাম, কোথাও কিছু নেই শুধু শুধু ঘুম থেকে জাগালে আমায়।

শান্তা লজ্জা পেয়ে আমাকে খুশি করার জন্য বলল, সিগারেট খাবে? সিগারেট দেশলাই এনে দেবো ?

আমি বললাম, না থাক ইচ্ছে করছে না।

আবার শুয়ে পড়লাম। সবে মাত্র ঘুমে চোখ জড়িয়ে এসেছে এই সময় আবার দরজায় শব্দ। এবার একটু জোরে।

শান্তা এবার রীতিমত ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, এই এই।

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, কাল সকালে ব্যাটাকে ঠাণ্ডা করবো।

শান্তা আরো ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলো, কে ? কাকে।

ইঁদুর। ধ্যাৎ, ইঁদুর কখনো এত জোরে আওয়াজ করতে পারে!

ইঁদুররা কি যে পারে আর কি যে পারে না তা কি আমার পক্ষে জানা সম্ভব। নিশ্চয়ই মস্ত বড় ধেড়ে ইঁদুর।

শান্তা বললো শব্দটা বাথরুমের দরজা থেকে আসছে।

এই একটা গুরুতর ব্যাপার। শান্তার প্রিয় বাথরুমে যদি ইঁদুর থাকে তাহলে তো সাংঘাতিক কথা। আবার আমাকে ফ্ল্যাট খুঁজতে হবে।

সুতরাং উঠতেই হলো। আগেরবার আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে শব্দটা থেমে গিয়েছিল, এবার অল্প শব্দ শুনতে পেলাম।

ঢক্-ঢক্—আমি ইঁদুর তাড়াবার ভঙ্গিতে হুশ হুশ করলাম। তবু আরেকবার শব্দটা হলো। বাথরুমের দরজা বাইরে থেকে ছিটকিনি বন্ধ—আমি দরজা খুলে দেখতে যাচ্ছি—শান্তা আমায় চেপে ধরলো, ভেতরে যদি কেউ থাকে!

সুতরাং কণ্ঠস্বর মোটা করে ধমকের সুরে জিজ্ঞাসা করলাম, কে ? ভেতরে কে ?

আর কোনও সাড়া শব্দ নেই।

শান্তা বললো, আমার ভয় করছে। আমার ভীষণ ভয় করছে।

ভয় পাওয়া মেয়েদের স্বভাব। অনেক সময় ভয় পেলে মেয়েদের মানায়। কিন্তু স্ত্রীর সামনে যে স্বামী সাহস দেখায় না তার জীবন ব্যর্থ।

আমি বীর দর্পে শান্তার হাত ছাড়িয়ে দরজাটা খুলে ফেললাম। কেউ ছুটে বেরিয়ে এসে আমাকে আক্রমণ করলো না। একটু অপেক্ষা করে বাথরুমের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম। না, কেউ নেই, কোনো ইঁদুরও না।

ভালো করে সব জায়গাটা পরীক্ষা করার পর আমি শান্তাকে ভেতরে ডাকলাম। শান্তাও দেখলো। বাথরুমের কোথাও বড়-সড় ইঁদুরের লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনাও নেই।

শান্তা বললো, তাহলে কিসের শব্দ বলো তো ?

হাওয়া ছাড়া আর কি হবে ?

হাওয়ায় কখনো এরকম শব্দ হয় ?

যাকগে, কাল সকালে সেটা চিন্তা করা যাবে। ভেতরে তো কেউ নেই দেখা গেল, সুতরাং ভয়ের কিছু নেই।

আবার সব দরজা-টরজা বন্ধ করে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম দু'জনে। বেশ কিছুক্ষণ দু'জনে আর কোনো কথা না বললেও দু'জনেই আসলে কান খাড়া করেছিলাম, আর কোনো শব্দ শোনা যায় কিনা।

আর শব্দ হলো না। শান্তা ঘুমিয়ে পড়ার পর আমিও ঘুমোলাম।

পরদিন সকালে উঠে শান্তা আর আমি দু'জনে মিলে আবার

বাথরুমটা তন্ন তন্ন করে খোঁজ করলাম। সেখানে কোনরকম সন্দেহ-জনক কিছু নেই। দিনের আলোয় অনেক কিছুই স্বাভাবিক মনে হয়। রাত্তিরবেলা অনেক ছোটো খাটো শব্দও খুব জোরে শোনায়, সুতরাং দরজা ধাক্কানোর ব্যাপারটা সেই রকমই একটা কিছু হবে—এই রকম ভেবে নিতে হলো।

ব্যাপারটা আমি তেমন গুরুত্ব না দিলেও সেদিন আমি বাড়ি ফিরে এলাম সন্ধ্যে হতে না হতেই। শান্তা খুব খুশি হলো। আমরা একসঙ্গে বেড়িয়ে একটা সিনেমা দেখে এলাম রাত্রির শো-তে। সারাক্ষণ আমরা গত রাত্রির ঘটনা নিয়ে কোনো আলোচনা করিনি। শুতে যাবার আগে শান্তা বললো, জানো, ঠিকে ঝি বলছিল, এই ফ্ল্যাটটায় খুব ঘন ঘন ভাড়াটে বদলায়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন ?

—তা জানি না। আগের ভাড়াটেরা নাকি মাত্র পনেরো দিন থেকেই চলে গেছে।

—ভাগ্যিস গেছে, নইলে এমন চমৎকার ফ্ল্যাটটা আমরা পেতাম না।

—ফ্ল্যাটটা তো ভালোই। কিন্তু···

—কিন্তু আবার কি। আজ যদি আবার শব্দ হয় কালকেই আমি ইঁদুর মারার ওষুধ কিনে আনবো।

শান্তাকে আমি হাসি ঠাট্টায় ভুলিয়ে রাখলাম—তারপর এক সময় ও ঘুমিয়ে পড়লো। আমি একটা বই খুলে জেগে রইলাম— বার বার তাকাচ্ছি দরজার দিকে। যেন আমি কারো প্রতীক্ষা করছি। সে এসে দরজা ধাক্কা দিলেই আমাকে খুলে দিতে হবে।

রাত্রি দেড়টা পর্যন্ত বই পড়লাম। আজ কোন রকম শব্দ নেই। তবু আমার ঘুম আসছে না। রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে একটা দুটো গাড়ি যাচ্ছে। এ ছাড়া থম থম করছে রাত। বাথ-রুমের দরজাটার দিকে তাকালেই আমার মনে হচ্ছে ওপাশে যেন

কেউ দাঁড়িয়ে আছে। আমি আলো নেভাইনি বলে দরজা ধাক্কা দিতে পারছে না।

কোনো একটা কিছু সম্পর্কে বেশিক্ষণ ভাবলেই এই রকম সব চিন্তা আসে। আমি বিছানা থেকে উঠে পড়ে বাথরুমের দরজাটা খুললাম। ভেতরের আলো জ্বেলে ভালো করে দেখে নিলাম একবার। বাইরের দিকের জানলাটাও বন্ধ করে দিলাম। হাওয়া আসবার কোন উপায় নেই। আজ আর কোন শব্দ হবে না।

দরজাটা আবার বন্ধ করে দিতে যাচ্ছি এমন সময় শান্তা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, কে? কে?

আমি শান্তা, আমি।

তুমি ওখানে কি করছো?

আরে তুমি ভয় পাচ্ছো নাকি? আমি বাথরুমে গিয়েছিলাম।

শান্তা উদ্‌ভ্রান্তের মতো জিজ্ঞেসা করলো, তুমি সত্যি বাথরুমে গিয়েছিলে? সত্যি করে বলতো, আজও নিশ্চয় আওয়াজ হয়েছিলো?

না না, কোন আওয়াজ হয়নি।

সত্যি বলছো?

হ্যাঁ, দেখো আর কোনোদিন আওয়াজ হবে না। কিন্তু আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ার পাঁচ মিনিট বাদেই আওয়াজটা শুরু হলো।

ঠক্ ঠক্—

শান্তা আমাকে জড়িয়ে ধরে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললে, ওকি হলো তুমি বলো।

আমি বললাম, চুপ, শুনতে দাও না।

— কি শুনবে?

— দেখি আর কি হয়।

দরজাটা আর কয়েকবার ঢক্ ঢক্ করলো—কিন্তু আর কিছুই হলো না।

শান্তা চাপা স্বরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। আমি বললাম, একটা রাত জেগে থেকে দেখা যাক্ না কি হয়।

শান্তা বললো, তুমি ঠিক ঘুমিয়ে পড়বে। তুমি ঘুমিয়ে পড়লে আমি ভয়ে মরে যাবো।

—না, ঘুমবো না। আর একটা কাজ করা যাক্। বাথরুমের দরজাটা খুলে ফাঁক করে রাখা যাক না।

উঠে তাই করলাম। শোবার ঘরের পাশের বাথরুমের দরজাটা খুলে রাখা শান্তার একেবারেই পছন্দ নয়। কিন্তু অতি কষ্টে ওকে রাজি করালাম। আর কোনো শব্দ হল না।

রাতটা কেটে গেল। সকালে উঠেই শান্তা বললো, এর একটা ব্যবস্থা না করলে তো চলে না। এই ভাবে কি প্রত্যেকটি রাত না ঘুমিয়ে কাটাবো নাকি ?

যতরকম ব্যাখ্যা দেওয়া যায় সবকটাই আমি শান্তাকে শোনালাম। যেমন, বাতাসের ধাক্কা তো হতেই পারে। তাছাড়া হঠাৎ কোন গাড়ির ঝাঁকানিতে কিংবা এ বাড়ির কোন ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করার সময় নিশ্চয়ই এই দরজাটা কেঁপে ওঠে।

শান্তা বিশ্বাস করলো না। দরজাটার গায়ে হাত দিয়ে বলল, দেখেছো, কি রকম শক্ত দরজা। এমনিতে কিছুতেই নড়তে পারে না।

আমি বললাম, ঠিক আছে, লক্ষ্য রেখো তো দিনের বেলা কোনো আওয়াজ হয় কিনা।

সেদিন বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় পড়ে আমার বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। বাড়ির বাইরের জগতটার সঙ্গে একবার জড়িয়ে পড়লে তখন আর বাড়ির কথা মনে থাকে না।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় একটু অপরাধ বোধ করলাম। শান্তা অনেকক্ষণ একলা আছে। রাত এগারোটা বেজে গেছে।

দু'তিনবার কলিং বেল টিপলাম, দরজা খোলে না. শান্তা কি ঘুমিয়ে পড়লো ?

বেল টিপতে টিপতেই আমি ডাকলাম, শান্তা ! শান্ত ! একটু বাদেই দরজা খুললো। শান্তার চোখে জল। এটা আমার কাছে নতুন ব্যাপার। দেরি করে বাড়ি ফিরলে শান্তা মাঝে মাঝে বেশ বকাবকি করে। কিন্তু প্রথমেই তো কাঁদে না।

আমি কিছু বলার আগেই শান্তা বললো, আমি বেঁচে থাকি কিংবা মরে যাই, তোমার তাতে কিছু যায় আসে না, না ?

অনুতপ্ত গলায় বললাম, শান্তা এসব কি বলছো ? হঠাৎ দেরি হয়ে গেল, মানে বোম্বে থেকে আমার এক পুরনো বন্ধু এসেছে। অনেকদিন পরে দেখা—

—বাড়ি ফিরে যদি দেখতে আমি মরে গেছি ?

—ছিঃ, এসব কি বলছো ? কেন কি হয়েছে ? তুমি ভয়টয় পেয়েছিলে নাকি ?

—যাকে সারাদিন সারা সন্ধ্যে একলা থাকতে হয়, তার কি ভয় পেলে চলে ?

—কি হয়েছে বলো না ? আবার কি দরজাটা···

—না, কিছু হয়নি।

কাছে গিয়ে শান্তার মাথায় হাত দিয়ে বললাম, লক্ষ্মীটি রাগ করো না। আর এক দিনও দেরি করবো না।

এরকম কতবার বলেছো ? জানো, এই ফ্ল্যাটে একটি মেয়ে আত্মহত্যা করেছিল ?

—যাঃ।

—আমাকে আজ দু'তিন জন বললো, মেয়েটি আমারই বয়েসী ছিল, খুব সুন্দর দেখতে।

—যাক্ গে, রাত্তির বেলা আর ঐসব গল্প বলতে হবে না। শোন আমি বাইরে থেকে খেয়ে এসেছি, খাবো না। শুয়ে পড়া

যাক্। আজ রাত্তিরটা ভালো করে ঘুমোতে হবে।

শান্তা আর কোন কথা বললো না। কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলো। জামা কাপড় বদলে আমি শুয়ে পড়ার জন্য তৈরি হলাম।

শান্তা বললো, আমি বাথরুমে যাবো। কিন্তু আমার ভয় করছে।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, এর মধ্যেই ভয় পাচ্ছো! আলো জ্বালা রয়েছে। আমি জেগে আছি।

শান্তার গলার আওয়াজটা যেন বদলে গেল। অদ্ভুত ভাবে বললো, আমি বাথরুমে গেলে তুমি বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেবে না তো ?

আমি চমকে গিয়ে বললাম, কি বলছো কি ? দরজা বন্ধ করে দেবো কেন ?

সত্যি করে বলো, দরজা বন্ধ করে দেবে না ? তুমি কোনোদিন আমাকে বাথরুমে আটকে রাখবে না ?

বলতে বলতে শান্তা হু হু করে কেঁদে ফেললো, কি রকম যেন পাগলের মত হয়ে গেছে। আমি ওর দু'হাত ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে বললাম, শান্তা, শান্তা, কি হলো এসব ? তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না ?

শান্তা কোনক্রমে নিজেকে একটু সামলে নিল। তারপর আস্তে আস্তে বললো সেই মেয়েটির স্বামী রাগ করে একদিন তাকে বাথরুমের মধ্যে আটকে রেখেছিল। মেয়েটি কত দরজায় ধাক্কা দিয়েছে তবু খোলেনি। তখন লজ্জায় অপমানে মেয়েটি আত্মহত্যা করেছিল।

আমি ধমক দিয়ে বললাম, যত সব গাঁজাখুরি গল্প। সেই মেয়েটিই বুঝি এসে রোজ দরজায় ধাক্কা দেয়। তা দেয় তো দিক না, সে তো আমাদের আর কোন ক্ষতি করে না।

অনেকক্ষণ ধরে শান্তাকে বোঝালাম। তারপর এক সময় ও

শুয়ে পড়লো। আমি আলো নিভিয়ে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম বাথরুমের দরজার পাশে। আলোতে প্রেতাত্মারা থাকে না শুনেছি। সেই দুঃখিনী মেয়েটি যদি দরজা ধাক্কাতে আসে আমি অন্ধকারেই দরজা খুলে তাকে দেখবো।

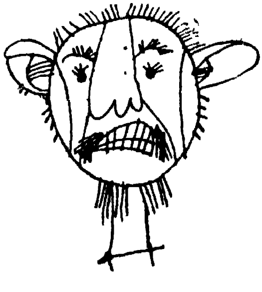
প্রায় ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়েছিলাম, কিছুই হোলো না, কোনো শব্দ নেই। তারপর ক্লান্ত হয়ে বিছানায় এসে শোয়া মাত্র দরজায় আওয়াজ হলো—ঢক ঢক ঢক ঢক।

শান্তা সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো, ঐ যে আবার—

আমি তড়াক করে বিছানা থেকে নেমে ছুটে এসে দরজা খুললাম। দারুন আশা ছিল মেয়েটিকে দেখতে পাবো। কেউ নেই। অন্ধকারেও কারুকে দেখা গেল না। শুধুই অন্ধকার।

না ভূত আমার ভাগ্যে নেই। আমার চোখের সামনে ওরা কেন যেন কিছুতেই আসতে চায় না। তবে, সেই দরজার আড়ালে কি ছিল, কেন বাথরুমের দরজায় কুণ্ঠিত ধাক্কা পড়তো তা আমি কোনো দিন জানতে পারিনি।

আবার ফ্ল্যাট বদল করতে হয়েছে শান্তার জন্য। এ ফ্ল্যাটের বাথরুম তেমন ভালো না, কিন্তু শান্তা আর কোন অভিযোগ করে না।



পেতনির গলা শুনে আমার গা ছমছম করে উঠেছিল সত্যি, কিন্তু রান্নাটা শেখার লোভও ছাড়তে পারলাম না।

ভূতরা চাউমিন ভালবাসে

শেখর বসু

ভাল্লুকদের মধ্যে একটা নিয়ম আছে। বাচ্চা ভাল্লুক একটু বড় হলেই নাকি বাবা-ভাল্লুক, মা-ভাল্লুক তাকে বাড়িতে ফেলে রেখে অন্য জায়গায় পালিয়ে যায় কয়েকদিনের জন্যে। পালিয়ে গিয়ে বাচ্চাকে বোঝাতে চায়, ঢের তোমাকে মধু খাইয়েছি, এবার নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াও, নিজের খাবার নিজে যোগাড় করো। বাচ্চাকে স্বাবলম্বী করার জন্যে বাবা-মা হঠাৎ উধাও হয়ে গেলে বাচ্চা ভাল্লুক প্রথম দিন কেঁদে-কেঁদে বাবা-মাকে খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু বাবা-মা তো তখন অনেক দূরে। খিদের জ্বালায় নিরুপায় হয়ে বাচ্চা ভাল্লুক নিজেই নিজের খাবার খুঁজতে শুরু করে দেয়। অনেক কষ্টে পেয়েও যায় শেষে। বাচ্চা ভাল্লুক শিকারে একটু পাকা হয়ে গেলেই বাবা-ভাল্লুক মা-ভাল্লুক ফিরে আসে বাড়িতে। তখন খুব আনন্দ। তারপর থেকে তিনজনেই যায় শিকারে।

শুধু ভাল্লুকরা নয়, অধিকাংশ জন্তু-জানোয়ারই নানা রকম কায়দা করে নিজেদের ছেলেমেয়েদের মানুষ করে। মানুষরা বাচ্চাদের কীভাবে মানুষ করে, সে-কথা তো সবাই জানে। ভূতরাও এখন বাচ্চা-ভূতদের ট্রেনিং দেয়। আপার নার্সারিতে বাচ্চা-ভূতরা মানুষের ঘাড়ে চাপার কায়দা শেখে। বড়-বড় মানুষদের ঘাড়ে নয়, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাঁধে।

সেদিন বুবু বাপ্পা ওদের মায়ের সঙ্গে দোকান থেকে ফিরছিল। বুবু আর বাপ্পার পরীক্ষা হয়ে গেছে বলে ওদেব মা ছুটো ব্যাডমিণ্টন র‍্যাকেট আর কক কিনে দিয়েছেন। আর কিনেছেন মস্ত এক প্যাকেট নুডল্‌স। বাড়ি ফিরে ওদের চাউমিন করে দেবেন।

টুকিটাকি জিনিস কিনতে কিনতে সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। বাড়ি ফেরার পথে যেই না ওরা তেকোনা মাঠের ঝাঁকড়া গাছটার নিচে এসেছে অমনি রাস্তার সব আলো নিবে গেল একসঙ্গে। পাওয়ার-কাট।

ওই ঝাঁকড়া গাছে থাকে এক ভূত আর এক পেতনি। আর থাকত তাদের আদরের বাচ্চা-ভূত। বাচ্চা-ভূত আপার নার্সারি ক্লাসের ছাত্র। আলো নিভে গেলে ভূত-পেতনি বাচ্চা-ভূতকে বলল, 'শিগ্‌গির গিয়ে ওই বাচ্চা ছুটোর ঘাড়ে চেপে বোস্। তোর তো পরীক্ষা এসে গেল সামনে। একদম হোম-ওয়ার্ক করিস না। যা যা, শিগ্‌গির।'

বাচ্চা-ভূতটা খুব লাজুক আর ভিতু। প্রথমে কিছুতেই যাবে না, শেষে অনেক বকুনি খেয়ে গেল।

মাঠে, রাস্তায় আবছা চাঁদের আলো পড়েছিল। সেই আলোয় বুবু র‍্যাকেটের ওপর কক্‌টাকে নাচাতে নাচাতে হাঁটছিল। নতুন র‍্যাকেটের স্ট্রিংয়ে আওয়াজ উঠেছিল টং টং টং।

ভূত-পেতনি বাচ্চা-ভূতকে শিখিয়ে দিয়েছিল কী ভাবে ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে উঠতে হবে। কিন্তু বাচ্চা-ভূত বুবুর পেছনে দাঁড়িয়ে কক্ নাচানো দেখে আসল কথাটাই ভুলে গেল বেমালুম। বাচ্চা ভূতের ব্যাডমিণ্টন খেলার খুব শখ। কদ্দিন ও ওর মাকে বলেছে, 'মা, আমাকে র‍্যাকেট কিনে দাও, কক্ কিনে দাও।' কিন্তু পেতনি ওর কথায় পাত্তাই দেয় না। বলে, 'ধ্যুত্, ব্যাডমিণ্টন তো মানুষরা খেলে, ভূতদের ওসব খেলতে নেই।'

তা, বাচ্চা-ভূত এতই তন্ময় হয়ে কক্-নাচানো দেখছিল যে বুবু

ওকে দেখে ফেলল এক সময়। বাচ্চা ভূত বুবুর মাথায়-মাথায়, বুবুরই বয়সী। বুবু ওকে জিজ্ঞেস করল, 'এই তোর নাম কী রে?'

বাচ্চা ভূত আমতা-আমতা করে বলল, 'তুরি।'

বুবু বলল, 'বাহ! বেশ মজার নাম তো! ব্যাডমিন্টন খেলবি? চ, আমাদের বাড়ি চ। বাপ্পা একদম খেলতে পারে না। আমি আর তুই খেলব। খেলা হয়ে গেলে চাউমিন খাবি। মা এখন চাউমিন বানাবে।'

তুরি ঘাড়ে চাপার কথা একেবারে ভুলে গিয়ে বুবুর সঙ্গে চলে গেল বুবুদের বাড়ি। ওর বাবা-মা পেছন থেকে ফিসফিস করে কতবার বলল, 'তুরি, চলে আয়, মানুষের বাড়ি খবর্দার যাস্‌নি।' কিন্তু তুরি বাবা-মায়ের কথা শুনেও শুনল না।

বুবুদের বাড়িতে তুরি মনের সুখে অনেক্ষণ ধরে ব্যাডমিণ্টন খেলল। তারপর খেল চাউমিন। চাউমিন তুরি আগে কখনো খায়নি। এই প্রথম খেল। আহা কী দারুণ খেতে! মুচমুচে নুডল্‌স্‌। তার মধ্যে চিংড়ি, সবুজ বীন, গোলাপি গাজর, আর লাল-টুকটুকে টোম্যাটো সস।

এত চমৎকার চাউমিন খাওয়ার পরে গাছে ফিরে এসে তুরি বাবা-মায়ের কাছে দারুণ বকুনি খেল। প্রথমে বকুনি, তারপর চড়-চাপড়, শেষে কানমলা। 'বাঁদর ভূত কোথাকার! তোকে বলা হল ওই বাচ্চা-হুটোর ঘাড়ে চাপ। তা না, তুই ওদের সঙ্গে সঙ্গে ওদের বাড়ি গেলি। এতক্ষণ ধরে মানুষের খেলা খেললি। চ্যাউমিন না কীসব আজেবাজে জিনিস খেয়ে তার আবার প্রশংসা হচ্ছে এখন।'

বকুনি আর মারধোর খেয়ে তুরি ঠোঁট ফুলিয়ে বসে থাকল অনেক্ষণ। ভূতদের স্কুল শুরু হয় মাঝ রাত্তিরে। তুরি বলল, 'স্কুলে যাব না।' যাবে না তো যাবেই না, কেউ ওকে স্কুলে নিয়ে যেতে পারল না। ভূতরা দুপুরের খাবার খায় শেষ রাত্তিরে। তুরির মা

আর বাবা দুটো ঘোড়ার ঠ্যাঙ নিয়ে এসেছিল। ঘোড়ার ঠ্যাঙ ভূতদের খুব প্রিয় খাবার। তুরি বলল, 'খাব না।'

এতক্ষণ ধরে বাচ্চা ভূতকে শাসন করে পেতনির মন খুব নরম হয়েছিল। ও তুরিকে জড়িয়ে ধরে আদর করে বলল, 'কী সুন্দর ঘোড়ার পা, কত কষ্ট করে তোর বাবা যোগাড় করে এনেছে। খাবি না কেন?'

তুরি কাঁদতে-কাঁদতে বলল, 'কাঁচা মাংস আমি আর খাব না।'

তুরির মা আধ জিভ কেটে বলল, 'কী অলুক্ষুনে কথা! ভূতরা তো কাঁচা মাংসই খায়।'

তুরি এবার ভ্যাঁ করে কেঁদে বলল, 'আমি চাউমিন খাব।'

খাবে তো খাবেই। ওর মা কত করে ওকে বোঝাল, 'ও-সব আমাদের খেতে নেই। মানুষদেব খাবার খেলে আমাদের নিন্দে হয়। তা ছাড়া চাউমিন কী এমন খাবার? আমি কাল রাত্তিরে তোর জন্যে কাকের মাথা বকের মাথা নিয়ে আসব।'

গলায় যত জোর আছে সব জোর একসঙ্গে করে তুরি চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'না, আমি চাউমিন খাব।' তারপর সে কী কান্না!

কান্না শুনে তুরির বাবা ভীষণ চটে উঠল। 'সারা রাত্তির খাটাখাটনির পরে দিনের বেলায় যে একটু বিশ্রাম নেব, এ-গাছে সে উপায়ও নেই! ধুত্তেরি!' এই না বলে তুরির বাবা গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে শূন্যে মিশে গেল। তুরির বাবা-বেচারার কী দোষ? ভূতদের অফিস-টফিস হয় রাত্তিরে, দিনের বেলায় ঘুম। শান্তিতে ঘুমোতে না পারলে কার না রাগ হয়?

তুরির কান্না আর থামে না। শেষে ছেলের বায়না সামলাবার জন্যে তুরির মা এক সন্ধেয় মানুষের বেশে তুরির হাত ধরে বুবু-বাপ্পাদের বাড়িতে গিয়ে হাজির। তুরিকে দেখে বুবু আর বাপ্পা হৈ-হৈ করে উঠল।

তুরির মা একা সে কথা বলার পরে বুবু-বাপ্পার মাকে বলল,

'সেদিন দিদি আপনি তুরিকে কী খাবার রেঁধে খাইয়েছিলেন, বাড়ি গিয়ে সে কী প্রশংসা। তারপর থেকে বায়না, আমাকে ওই খাবার বানিয়ে দাও। আমার হয়েছে মহা জ্বালা। আমি আবার রান্না-বান্না তেমন জানি না। শেষে বললাম, ঠিক আছে, বুবু-বাপ্পার মা'র কাছ থেকে রান্না শিখে এসে তোকে খাওয়াব।'

শুনে বুবু-বাপ্পার মা বেশ লজ্জা পেয়ে বললেন, 'ন্‌না, এ কী বলছেন। আমিও তেমন রান্না-বান্না জানি না। ওরা ধরেছিল, তাই একটু চাউমিন বানিয়েছিলাম।

তুরির মা আরও কিছুক্ষণ গল্প করার পরে কী করে চাউমিন বানায় শিখে গাছে ফিরে এল। তারপর দরকারি জিনিসপত্তর যোগাড় করে মাঝরাতে বানাল চাউমিন। সেই চাউমিন খেয়ে হৈ-চৈ পড়ে গেল ভূতদের পাড়ায়। 'মানুষরা এত ভাল খাবার বানায়, আর আমরা এত কষ্ট করে কাঁচা মাংস চিবোই!'

পরদিন তুরির মা আবার গেল বুবু-বাপ্পাদের বাড়ি। বুবু-বাপ্পার মা আস্ত একটা রান্নার বইই উপহার দিয়ে দিলেন তুরির মাকে।

সেই থেকে ভূতদের মধ্যে মানুষের খাবারের খুব চল, বিশেষ করে চাউমিনের। ভূতরা এখন আর ভূতদের খাবার খায় না।

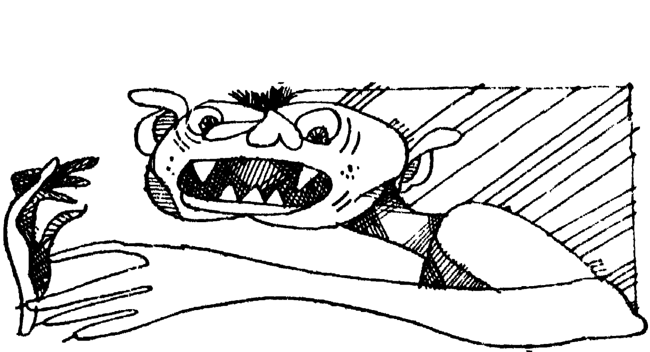
কথাটা অনেক আগেই আমার কানে এসেছিল, কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনি। কেউ গম্ভীর হয়ে ও-সব বললে আমি হেসে উড়িয়ে দিতাম। তবে, পরশু রাতে নিজের কানে যা শুনলাম, তা অবিশ্বাস করা অসম্ভব।

পরশু সন্ধেয় এক পশলা বৃষ্টি হওয়ার পরে শীত নেমেছিল চেপে। আকাশে থমথমে লাল মেঘ, তার মানে আরও বৃষ্টি হবে। বাড়ি ফেরার জন্যে আমি শর্টকাট রাস্তা ধরেছিলাম। ওই রাস্তাটায় আলো ছিল না। আর বাঁকের মুখে ছিল ঝুপসি এক আমগাছ।

ওই গাছের নিচে যেতেই আমার গা ছমছম করে উঠল। পরিষ্কার শুনতে পেলাম এক পেত্‌নি আর-এক পেত্‌নিকে 'প্রন্‌স্‌ ইন বাটার' শেখাচ্ছে। বলছে, 'চিংড়ি মাছ নিবি ৫০০ গ্রাম। সঙ্গে ডিম চারটে, ময়দা ২৫০ গ্রাম, বেকিং-পাউডার চা-চামচের আধ চামচ, নুন আন্দাজ মতো। ভাজার জন্যে বাদাম তেল। ময়দায় ডিম ও জল মিশিয়ে ফেটিয়ে নিতে হবে। চিংড়ির খোলা ও মাথা বাদ দিয়ে নুন মাখিয়ে রাখতে হবে। তারপর গোলায় ডুবিয়ে ছাঁকা তেলে ভাজতে হবে। তারপর পরিবেশন করো গরম-গরম, সঙ্গে একটু টোমাটো সস দিতে পারলে দারুণ হয়।'

পেতনির গলা শুনে আমার গা ছমছম করে উঠেছিল সত্যি, কিন্তু রান্নাটা শেখার লোভও ছাড়তে পারলাম না। পায়ে পায়ে হাঁটতে হাঁটতে রান্নাটা শিখে নিলাম, তারপরেই দে ছুট।

যেমন-যেমন শুনেছিলাম, তেমন-তেমন বললাম আমাদের রাঁধুনিকে। আহ! যা হয়েছিল না 'প্রন্‌স্‌ ইন বাটার'! অত ভাল খাবার আমি কখনো খাইনি। জানি না, পেত্‌নিরা এর মধ্যে নিজেদের কোনো কায়দা ঢুকিয়েছে কি না!



অবাক হয়ে দেখেন, ব্রেকভ্যান থেকে অবিকল গার্ডের পোষাক পরা একট
লোক হাতবাতি তুলে সবুজ আলো দেখাচ্ছে ড্রাইভারকে

গন্ধটা খুব সন্দেহজনক

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সেবার আমার দিদিমা পড়লেন ভারী বিপদে!

দাদামশাই রেল কোম্পানিতে চাকরি করতেন, সে আজ পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। আমার মা তখনও ছোট্ট। ইজের-পরা খুকি। তখন এত সব শহর নগর ছিল না, লোকজনও এত দেখা যেত না। চারধারে কিছু গাছ গাছালি, জঙ্গল-টঙ্গল ছিল। সেই রকমই এক নির্জন জঙ্গুলে জায়গায় দাদামশাই বদলি হলেন। উত্তর বাংলার দোমোহানীতে। মালগাড়ির গার্ড ছিলেন, তাই প্রায় সময়েই তাঁকে বাড়ির বাইরে থাকতে হত। কখনো এক নাগাড়ে তিন, চার কিংবা সাত দিন। তারপর ফিরে এসে হয়তো একদিন মাত্র বাসায় থাকতেন, ফের মাল গাড়ি করে চলে যেতেন। আমার মায়েরা পাঁচ বোন আর চার ভাই। দিদিমা এই মোট ন'জন ছেলেমেয়ে নিয়ে বাসায় থাকতেন। ছেলে-মেয়েরা সবাই তখন ছোটো ছোটো, কাজেই দিদিমার ঝামেলার অন্ত নেই।

এমনিতে দোমোহানী জায়গাটা ভারি সুন্দর আর নির্জন স্থান। বেঁটে বেঁটে লিচু গাছে ছাওয়া, পাথরকুচি ছড়ানো রাস্তা, সবুজ মাঠ, কিছু জঙ্গল ছিল। লোকজন বেশি নয়। এক ধারে পাকা কোয়ার্টার, আর অন্য ধারে রেলের বাবুদের জন্য আধপাকা

কোয়ার্টার, একটা ইস্কুল ছিল ক্লাস এইট পর্যন্ত। একটা রেলের ইনস্‌টিটিউট ছিল, যেখানে প্রতি বছর দু'তিন বার কেদার রায় বা টিপু সুলতান নাটক হত। রেলের বাবুরা দল বেঁধে গ্রীষ্মকালে ফুটবল খেলতেন, শীতকালে ক্রিকেট। বড় সাহেবরা সে-খেলা দেখতে আসতেন। মাঝে মাঝে সবাই দল বেঁধে তিস্তা নদীর ধারে বা জয়ন্তিয়া পাহাড়ে চুড়ুইভাতিতেও যাওয়া হত। ছোটো আর নির্জন হলেও বেশ আমুদে জায়গা ছিল দোমোহানী।

দোমোহানীতে যাওয়ার পরই কিন্তু সেখানকার পুরোনো লোকজনেরা এসে প্রায়ই দাদামশাই আর দিদিমাকে একটা বিষয়ে খুব হুঁশিয়ার করে দিয়ে যেতেন। কেউ কিছু ভেঙে বলতেন না। যেমন স্টোর কীপার অক্ষয় সরকার দাদামশাইকে একদিন বললেন, 'এ জায়গাটা কিন্তু তেমন ভাল নয় চাটুজ্যে। লোকজন সব বাজিয়ে নেবেন। হুটহাট যাকে তাকে ঘরে দোরে ঢুকতে দেবেন না।' কিংবা আর একদিন পাশের বাড়ির পালিত-গিন্নি এসে দিদিমাকে হেসে হেসে বলে গেলেন, 'নতুন এসেছেন, বুঝবেন সব আস্তে আস্তে। চোখ কান নাক সব খোলা রাখবেন কিন্তু। ছেলে পুলেদেরও সামলে রাখবেন। এখানে কারা সব আছে, তারা ভাল নয়।'

দিদিমা ভয় পেয়ে বলেন, 'কাদের কথা বলছেন দিদি ?'

পালিত-গিন্নী শুধু বললেন, 'সে আছে, বুঝবেনখন।'

তারপর থেকে দিদিমা একটু ভয়ে ভয়ে থাকতে লাগলেন।

একদিন হল কী, পুরোনো ঝি সুখীয়ার দেশ থেকে চিঠি এলো যে তার ভাসুরপোর খুব বিমার হয়েছে, তাই তাকে যেতে হবে। এক মাসের ছুটি নিয়ে সুখীয়া চলে গেল। দিদিমা নতুন ঝি খুঁজছেন, তা হঠাৎ করে পরদিন সকালেই একটা আধবয়সী বউ এসে বলল, 'ঝি রাখবেন ?'

দিদিমা দোনামনা করে তাকে রাখলেন। সে দিব্যি কাজকর্ম

করে, খায়দায়, বাচ্চাদের গল্প বলে ভোলায়। দিন দুই পর পালিত-গিন্নী একদিন সকালে এসে বললেন, 'নতুন ঝি রাখলেন নাকি দিদি ? কই দেখি তাকে।'

দিদিমা ডাকতে গিয়ে দেখেন, কলতলায় এঁটো বাসন ফেলে রেখে ঝি কোথায় হাওয়া হয়েছে। অনেক ডাকাডাকিতেও পাওয়া গেল না। পালিত-গিন্নী মুচকি হাসি হেসে বললেন, 'ওদের ও রকমই ধারা। ঝি-টার নাম কি বলুন তো ?'

দিদিমা বললেন, 'কমলা।'

পালিত-গিন্নী মাথা নেড়ে বললেন, 'চিনি, হালদার-বাড়িতেও ওকে রেখেছিল।'

দিদিমা অতিষ্ঠ হয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো ?'

পালিত-গিন্নী শুধু শ্বাস ফেলে বললেন, 'সব কি খুলে বলা যায় ? এখানে এই হচ্ছে ধারা। কোনটা মানুষ আর কোনটা মানুষ নয় তা চেনা ভারি মুশকিল। এবার দেখে শুনে একটা মানুষ ঝি রাখুন।'

এই বলে চলে গেলেন পালিত গিন্নী, আর দিদিমা আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলেন।

কমলা অবশ্য একটু বাদেই ফিরে এল। দিদিমা তাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'কোথায় গিয়েছিলে ?'

সে মাথা নিচু করে বলল, 'মা, লোকজন এলে আমাকে সামনে ডাকবেন না, আমি বড় লজ্জা পাই।'

কমলা থেমে গেল। কিন্তু দিদিমার মনের খটকা-ভাবটা গেল না।

ওদিকে দাদামশাইয়েরও এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল। একদিন লাইনে গেছেন। নিশুতি রাতে মালগাড়ি যাচ্ছে ডুয়ার্সের গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। দাদামশাই ব্রেক ভ্যানে বসে ঝিমোচ্ছেন। হঠাৎ গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল। তা মালগাড়ি যেখানে-সেখানে

দাঁড়ায়। স্টেশনের পয়েন্টসম্যান আর অ্যাসিসট্যান্ট স্টেশন মাস্টাররা অনেক সময় রাত বিরেতে ঘুমিয়ে পড়েন, সিগন্যাল দিতে ভুলে যান। সে-আমলে এরকম হামেশা হত। সেই রকমই কিছু হয়েছে ভেবে দাদামশাই বাক্স থেকে পঞ্জিকা বের করে পড়তে লাগলেন, পঞ্জিকা পড়তে তিনি বড় ভালবাসতেন। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। হঠাৎ দাদামশাই শুনতে পেলেন, ব্রেক ভ্যানের পিছনে লোহার সিঁড়ি বেয়ে কে যেন গাড়ির ছাদে উঠছে। দাদামশাই মুখ বার করে কাউকে দেখতে পেলেন না। ফের শুনলেন, একটু দূরে কে যেন ওয়াগনের পাল্লা খোলার চেষ্টা করছে। খুব চিন্তায় পড়লেন দাদামশাই। ডাকাতরা অনেক সময় সাঁট করে সিগন্যাল বিগড়ে দিয়ে গাড়ি থামিয়ে মালপত্র চুরি করে। তাই তিনি সরেজমিনে দেখার জন্য গাড়ি থেকে হাত বাতিটা নিয়ে নেমে পড়লেন। লম্বা ট্রেন, তার একদম ডগায় ইঞ্জিন। হাঁটতে হাঁটতে এসে দেখেন, লাল সিগন্যাল ইতিমধ্যে সবুজ হয়ে গেছে, কিন্তু ড্রাইভার আর ফায়ারম্যান কয়লার ঢিবির ওপর গামছা পেতে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। ওদেরও দোষ নেই, অনেকক্ষণ নাগাড়ে ডিউটি দিচ্ছে, একটু ফাঁক পেয়েছে কি ঘুমিয়ে পড়েছে। বহু ঠেলাঠেলি করে তাদের তুললেন দাদামশাই। তারপর ফের লম্বা গাড়ি পার হয়ে ব্রেক ভ্যানের দিকে ফিরে আসতে লাগলেন। মাঝামাঝি এসেছেন, হঠাৎ শোনেন ইঞ্জিন হুইশল দিল, গাড়িও ক্যাঁচ কোঁচ করে চলতে শুরু করল। তিনি তো অবাক। ব্রেক ভ্যানে ফিরে গিয়ে তিনি সবুজ বাতি দেখালে তবে ট্রেন ছাড়বার কথা। দাদামশাই হাঁ করে চেয়ে রইলেন। অবাক হয়ে দেখেন, ব্রেক ভ্যান থেকে অবিকল গার্ডের পোশাক পরা একটা লোক হাতবাতি তুলে সবুজ আলো দেখাচ্ছে ড্রাইভারকে। ব্রেক ভ্যানটা যখন দাদামশাইকে পার হয়ে যাচ্ছে তখন লোকটা তাঁর দিকে চেয়ে ফিক করে হেসে গেল।

বহু কষ্টে দাদামশাই সেবার ফিরে এসেছেন। সেবার ম্যাজিশিয়ান প্রফেসর ভট্টাচার্য চা-বাগানগুলোতে ঘুরে ঘুরে ম্যাজিক দেখিয়ে দোমোহানীতে এসে পৌঁছালেন। তিনি এলে-বেলে খেলা দেখাতেন। দড়ি কাটার খেলা, তাসের খেলা, আগুন খাওয়ার খেলা। তা দোমোহানীর মতো গঞ্জ জায়গায় সেই খেলা দেখাতেই লোক ভেঙে পড়ল। ভট্টাচার্য স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে প্রথম দৃশ্যে একটু বক্তৃতা করছিলেন, হাতে ম্যাজিকের ছোট্ট কালো লাঠি। বলছিলেন, ম্যাজিক মানেই হচ্ছে হাতের কৌশল, মন্ত্রতন্ত্র নয়, আপনারা যদি কৌশল ধরে ফেলেন, তাহলে দয়া করে চুপ করে থাকবেন। কেউ যেন স্টেজে টর্চের আলো ফেলবেন না···ইত্যাদি।

এইসব বলছেন, ম্যাজিক তখনো শুরু হয়নি, দেখা গেল তাঁর হাতের লাঠিটা হঠাৎ হাত থেকে শূন্যে উঠে ডিগবাজি গেল, আবার আস্তে আস্তে ফিরে গেল ম্যাজিশিয়ানের হাতে। প্রথমেই এই আশ্চর্য খেলা দেখে সবাই প্রচণ্ড হাততালি দিল। কিন্তু প্রফেসর ভট্টাচার্য খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। এর পরের খেলা—ব্লাকবোর্ডে দর্শকেরা চক দিয়ে যা খুশি লিখবেন, আর প্রফেসর ভট্টাচার্য চোখ-বাঁধা অবস্থায় তা বলে দেবেন। কিন্তু আশ্চর্য, প্রফেসর ভট্টাচার্যের এই খেলাটা মোটেই সে রকম হলো না। দর্শকেরা গিয়ে ব্লাকবোর্ডে লিখবেন এ নিয়ে এ ওকে ঠেলছেন, প্রফেসর ভট্টাচার্য চোখের ওপর ময়দার নেচি আর কালো কাপড় বেঁধে দাঁড়িয়ে সবাইকে বলছেন—চলে আসুন, সংকোচের কিছু নেই, আমি বাঘভল্লুক নই······ইত্যাদি। সে সময় হঠাৎ দেখা গেল, কেউ যাওয়ার আগেই টেবিলের ওপর রাখা চকের টুকরোটা নিজে থেকেই লাফিয়ে উঠল, শূন্যে ভেসে গিয়ে ব্লাকবোর্ডের ওপর লিখতে লাগল, প্রফেসর ভট্টাচার্য ইজ দি বেস্ট ম্যাজিসিয়ান অফ দি ওয়ার্ল্ড। এই অসাধারণ খেলা দেখে দর্শকরা ফেটে পড়ল উল্লাসে, আর ভট্টাচার্য কাঁদো-কাঁদো হয়ে চোখ-বাঁধা অবস্থায় বলতে লাগলেন,

কী হয়েছে! অ্যাঁ, কী হয়েছে! এবং তারপর তিনি আরো গ হয়ে গেলেন। আগুন খাওয়ার খেলাতেও আশ্চর্য ঘটনা ঘটালেন তিনি। কথা ছিল মশাল জ্বেলে সেই মশালটা মুখে পুরে আগুনটা খেয়ে ফেলবেন। তাই করলেন। কিন্তু তারপরই দেখা গেল, ভট্টাচার্য হাঁ করতেই তার মুখ থেকে সাপের জিভের মতো আগুনের হলকা বেরিয়ে আসছে। পরে তাসের খেলা যখন দেখাচ্ছেন, তখনো দেখা গেল, কথা বলতে গেলেই আগুনের হলকা বেরোয়। দর্শকরা দাঁড়িয়ে উঠে সাধুবাদ দিতে লাগল। কিন্তু ভট্টাচার্য খুব কাঁদো কাঁদো মুখে চার পাঁচ সাত গ্লাস জল খেতে লাগলেন স্টেজে দাঁড়িয়েই। তবু হাঁ করলেই আগুনের হলকা বেরোয়। তখনকার মফস্বল শহরের নিয়ম ছিল বাইরে থেকে কেউ এরকম খেলা টেলা দেখাতে এলে তাঁকে কিংবা তাঁর দলকে বিভিন্ন বাসায় সবাই আশ্রয় দিতেন। প্রফেসর ভট্টাচার্য আমার মামার বাড়িতে উঠেছিলেন। রাতে খেতে বসে দাদামশাই তাঁকে বললেন, 'আপনার খেলা গণপতির চেয়েও ভাল। অতি আশ্চর্য খেলা।'

ভট্টাচার্যও বললেন, 'হ্যাঁ অতি আশ্চর্য খেলা। আমিও এ রকম আর দেখি নি।'

দাদামশাই অবাক হয়ে বললেন, 'সে কী! এতো আপনিই দেখালেন।'

ভট্টাচার্য আমতো আমতো করে বললেন, 'আমিই তো দেখালাম। আশ্চর্য!'

তাঁকে খুবই বিস্মিত মনে হচ্ছিল।

দাদামশাইয়ের বাবা সেবার বেড়াতে এলেন দোমোহানীতে। বাসায় পা দিয়েই বললেন, 'তোদের ঘরদোরে একটা আঁশটে গন্ধ কেন রে?'

সবাই বললে, 'আঁশটে গন্ধ! কই, আমরা তো পাচ্ছি না।'

দাদামশাইয়ের বাবা ধার্মিক মানুষ; খুব পণ্ডিত লোক, মাথা

নেড়ে বললেন, 'আলবৎ আঁশটে গন্ধ। সে শুধু তোদের বাসাতেই নয়, স্টেশনে নেমেও গন্ধটা পেয়েছিলাম। পুরো এলাকাতেই যেন আঁশটে-আঁশটে গন্ধ একটা।'

কমলা দাদামশাইয়ের বাবাকে দেখেই গা ঢাকা দিয়েছিল, অনেক ডাকাডাকিতেও সামনে এল না। দিদিমার তখন ভারি মুশকিল। একা হাতে সব সামলাতে হচ্ছে। দাদামশাইয়ের বাবা সব দেখে শুনে খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, 'এসব ভাল কথা নয়, গন্ধটা খুব সন্দেহজনক।'

সেদিনই বিকেলে স্টেশন মাস্টার হরেন সমাদ্দারের মা এসে দিদিমাকে আড়ালে ডেকে বললেন, 'কমলা আমাদের বাড়িতে গিয়ে বসে আছে। তা বলি বাছা, তোমার শ্বশুর ধার্মিক লোক সে ভাল। কিন্তু উনি যদি জপতপ বেশি করেন, ঠাকুর দেবতার নাম ধরে ডাকাডাকি করেন, তাহলে কমলা এ বাড়িতে থাকে কী করে ?

দিদিমা অবাক হয়ে বললেন, 'এ সব কী কথা বলছেন মাসিমা ? আমার শ্বশুর জপতপ করলে কমলার অসুবিধে কী ?'

সমাদ্দারের মা তখন দিদিমার থুতনি নেড়ে দিয়ে বললেন, 'ও হরি, তুমি বুঝি জানো না ? তাই বলি বাছা, দোমোহানীর সবাই জানে যে, এ হচ্ছে ঐ দলেরই রাজত্ব। ঘরে ঘরে ওরাই সব ঝি-চাকর খাটছে। বাইরে থেকে চেহারা দেখে কিছু বুঝবে না, ওরা হচ্ছে সেই তারা।'

'কারা ?' দিদিমা তবু অবাক।

'বুঝবে বাপু রোসো।' বলে সমাদ্দারের মা চলে গেলেন।

তা কথাটা মিথ্যে নয়। দোমোহানীতে তখন ঝি চাকর কিংবা কাজের লোকের বড় অভাব। ডুয়ার্সের ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, মশা আর বাঘের ভয়ে কোন লোক সেখানে যেতে চায় না। যাদের না গিয়ে উপায় নেই, তারাই যায়। আর গিয়েই পালাই

পালাই করে। তবু ঠিক দেখা যেত, কারো বাসায় ঝি চাকর বা কাজের লোকের অভাব হলেই ঠিক লোক জুটে যেত। স্টেশন মাস্টার সমাদ্দারের ঘরে একবার দাদামশাই বসে গল্প করছিলেন। সমাদ্দার একটা চিঠি লিখছিলেন, সেটা শেষ করেই ডাকলেন, 'ওরে কে আছিস?' বলা মাত্র একটা ছোকরা মতো লোক এসে হাজির। সমাদ্দার তার হাতে চিঠিটা দিয়ে বললেন, 'যা এটা ডাকে দিয়ে আয়।' দাদামশাই তখন জিজ্ঞেস করলেন, 'লোকটাকে নতুন রেখেছেন নাকি?' সমাদ্দার মাথা নেড়ে বললেন, 'না না ফাই-ফরমাশ খেটে দিয়ে যায় আর কি। খুব ভাল ওরা, ডাকলেই আসে। লোক-টোক নয়, ওরা ওরাই।'

তাই তো। মামাদের বাড়িতে প্রাইভেট পড়াতেন ধর্মদাস নামে একজন বেঁটে আর ফর্সা ভদ্রলোক। তিনি থিয়েটারে মেয়ে সেজে এমন মিহি গলায় মেয়েলী পার্ট করতেন যে, বোঝাই যেত না তিনি মেয়ে না ছেলে। সেবার সিরাজদ্দৌল্লা নাটকে তিনি লুৎফা। গিরীশ ঘোষের নাটক। কিন্তু নাটকের দিনই তাঁর ম্যালেরিয়া জাগিয়ে উঠল। লেপ চাপা হয়ে কোঁ-কোঁ করছেন। নাটক প্রায় সিকেয় ওঠে। কিন্তু ঠিক দেখা গেল, নাটকের সময়ে লুৎফার অভাব হয়নি। একেবারে ধর্মদাস মাস্টার মশাই ই যেন গোঁফ কামিয়ে আগাগোড়া নিখুঁত অভিনয় করে গেলেন। কেউ কিছু টের পেল না। কিন্তু ভিতরকার কয়েকজন ঠিকই জানত যে, সেদিন ধর্মদাস মাস্টার মশাই মোটেই স্টেজে নামেন নি। নাটকের শেষে দাদামশাই সমাদ্দার মশাইয়ের সঙ্গে ফিরে আসছিলেন। সমাদ্দার মশাই বললেন, 'দেখলেন কেমন কার্যোদ্ধার হয়ে গেল। একটু খোনা সুরও কেউ টের পায় নি।'

দাদামশাই তখন চেপে ধরলেন সমাদ্দারকে, 'মশাই রহস্যটা কী একটু খুলে বলবেন?'

সমাদ্দার হেসে সাতখান হয়ে বললেন, 'সবই তো বোঝেন

মশাই। একটা নীতি বলে রাখি, সদ্‌ভাব রাখলে সকলের কাছ থেকেই কাজ পাওয়া যায়। কথাটা খেয়াল রাখবেন।'

মামাদের মধ্যে যারা একটু বড় তারা বাইরে খেলে বেড়াত। মা আর বড়মাসি তখন কিছু বড় হয়েছে। অন্য মামা-মাসিরা তখন নাবালক নাবালিকা। মার বড় লুডো খেলার নেশা ছিল। মা আর মাসি রোজ দুপুরে লুডো পেড়ে বসত, তারপর ডাক দিত, 'আয় রে', অমনি টুক করে কোথা থেকে মায়ের বয়সীই দুটো মেয়ে হাসিমুখে লুডো খেলতে বসে যেত। মামাদের মধ্যে যারা বড় হয়েছে, সেই বড় আর মেজ মামা যেত বল খেলতে। দুটো পার্টিতে প্রায়ই ছেলে কম পড়ত। ছোট জায়গা তো, বেশি লোকজন ছিল না। কিন্তু কম পড়লেই মামারা ডাক দিত, 'কে খেলবি আয়।' অমনি চার পাঁচ জন এসে হাজির হত, মামাদের বয়সীই ছেলে। খেলা খুব জমিয়ে দিত।

এই খেলা নিয়েই আর একটা কাণ্ড হল একবার। দোমোহানীর ফুটবল টিমের সঙ্গে এক চা-বাগানের টিমের ম্যাচ। চা-বাগান থেকে সাঁওতাল আদিবাসী দুর্দান্ত চেহারার খেলোয়াড় সব এসেছে। দোমোহানীর বাঙালী টিম জুত করতে পারছে না, হঠাৎ দোমোহানীর টিম খুব ভাল খেলা শুরু করল, দুটো গোল শোধ দিয়ে আরো একখানা দিয়েছে। এমন সময়ে চা-বাগান টিমের ক্যাপটেন খেলা থামিয়ে রেফারীকে বললো, 'ওরা বারো জন খেলছে।' রেফারী গুনে দেখলেন, না, এগারো জনই। ফের খেলা শুরু হতে একটু পরে রেফারী খেলা থামিয়ে দোমোহানীর ক্যাপটেনকে ডেকে বললেন, 'তোমাদের টিমে চার পাঁচ জন একস্ট্রা লোক খেলছে।'

দুর্দান্ত সাহেব রেফারী, সবাই ভয় পায়। দোমোহানীর ক্যাপটেন বুক ফুলিয়ে বলল, 'গুনে দেখুন।' রেফারী গুনে দেখে আহাম্মক। এগারো জনই।

দোমোহানীর টিম আরো তিনটে গোল দিয়ে দিয়েছে। রেফারী আবার খেলা থামিয়ে ভীষণ রেগে চেঁচিয়ে বললেন, 'দেয়ার আর অ্যাটলীস্ট টেন মেন একস্ট্রা ইন দিস টিম।'

দর্শকদেরও তাই মনে হয়েছে। গুনে দেখা যায় এগারো জন কিন্তু খেলা শুরু হতেই যেন ঘাসের বুকে লুকিয়ে থাকা, কিংবা বাতাসের মধ্যে মিলিয়ে থাকা সব খেলোয়াড় পিল পিল করে নেমে পড়ে মাঠের মধ্যে। রেফারী দোমোহানীর টিমকে লাইন আপ করিয়ে সকলের মুখ ভাল করে দেখে বললেন, 'শেষ তিনটে গোল যারা করেছে তারা কই? তাদের তো দেখছি না। একটা কালো ঢ্যাঙা ছেলে, একটা বেঁটে আর ফর্সা, আর একটা ষাঁড়ের মতো, তারা কই?'

দোমোহানীর ক্যাপটেন মিন মিন করে যে সাফাই গাইল, তাতে রেফারী আরো রেগে টং। চা-বাগানের টিমও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হাফ্‌সে পড়েছে। কিন্তু কেউ কিছু বুঝতে পারছে না।

খেলা অবশ্য বন্ধ হয়ে গেল। দাদামশাইয়ের বাবা লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে খেলার হালচাল দেখে বললেন, 'আবার সেই গন্ধ। এখানেও একটা রহস্য আছে, বুঝলে সমাদ্দার?'

স্টেশন মাস্টার সমাদ্দার পাশেই ছিলেন, বললেন, 'ব্যাটারা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।'

'কে? কাদের কথা বলছো?'

সমাদ্দার এড়িয়ে গেলেন। দাদা মশাইয়ের বাবা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'গন্ধটা খুব সন্দেহজনক।'

দাদা মশাইয়ের বাবা সবই লক্ষ্য করতেন, আর বলতেন, 'এসব ভাল কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক। ও বৌমা এসব কী দেখেছি তোমাদের এখানে? হুট বলতেই সব মানুষজন এসে পড়ে কোত্থেকে আবার হুশ করে মিলিয়ে যায়। কাল মাঝ রাতে উঠে একটু তামাক খাওয়ার ইচ্ছে হল, উঠে বসে কেবলমাত্র আপন মনে

বলেছি, একটু তামাক খাই। অমনি কে যেন বলে উঠল, 'এই যে বাবুমশাই, তামাক সেজে দিচ্ছি। অবাক হয়ে দেখি, সত্যিই একটা লোক কল্কে ধরিয়ে এনে হুকোয় বসিয়ে দিয়ে গেল। এরা সব কারা ?'

দিদিমা আর কী উত্তর দেবেন ? চুপ করে থাকেন। দাদা-মশাইও বেশি উচ্চবাচ্য করেন না। বোঝেন সবই। কিন্তু দাদামশাইয়ের বাবা কেবলই চার ধারে বাতাস শুঁকে শুঁকে বেড়ান আর বলেন, 'এ ভাল কথা নয়, গন্ধটা খুব সন্দেহজনক।

মা প্রায়ই তাঁর দাদুর সঙ্গে বেড়াতে যেতেন। রাস্তাঘাটে লোকজন কারুর সঙ্গে দেখা হলে তারা সব প্রণাম বা নমস্কার করে সম্মান দেখাত দাদামশাইয়ের বাবাকে; কুশল প্রশ্ন করত। কিন্তু দাদামশাইয়ের বাবা বলতেন, 'রোসো বাপু, আগে তোমাকে ছুঁয়ে দেখি, গায়ের গন্ধ শুঁকি, তারপর কথাবার্তা।' এই বলে তিনি যাদের সঙ্গে দেখা হত তাদের গা টিপে দেখতেন, শুঁকতেন, নিশ্চিন্ত হলে কথাবার্তা বলতেন। তা তাঁর দোষ দেওয়া যায় না। সেই সময়ে দোমোহানীতে রাস্তায় ঘাটে বা হাটেবাজারে যে সব মানুষ দেখা যেত তাদের বারো আনাই নাকি সত্যিকারের মানুষ নয়। তা নিয়ে অবশ্য কেউ মাথা ঘামাত না। সকলেরই অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

অভ্যাস জিনিসটাই ভারি অদ্ভুত! যেমন বড় মামার কথা বলি। দোমোহানীতে আসবার অনেক আগে থেকেই তাঁর ভারি ভূতের ভয় ছিল। তাঁরও দোষ দেওয়া যায় না। ঐ বয়সে ভূতের ভয় কারই বা না থাকে। তাঁর কিছু বেশি ছিল। সন্ধ্যের পর ঘরের বার হতে হলেই তাঁর সঙ্গে কাউকে যেতে হত। দোমো-হানীতে আসবার অনেক পরেও সে অভ্যাস যায়নি। একদিন সন্ধ্যে বেলা বসে ধর্মদাস মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়ছেন একা, বাড়ির সবাই পাড়া-বেড়াতে গেছে। ঠিক সেই সময়ে তাঁর বাথরুমের

যাওয়ার দরকার হল। মাস্টার মশাইকে তো আর বলতে পারেন না, আপনি আমার সঙ্গে দাঁড়ান। তাই বাধ্য হয়ে ভিতর বাড়িতে অন্ধকারকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'এই শুনছিস ?'

অমনি একটা সমবয়সী ছেলে এসে দাঁড়াল, 'কী বলছো ?'

'আমি একটু বাথরুমে যাবো, আমার সঙ্গে একটু দাঁড়াবি চলতো !'

সেই শুনে ছেলেটা তো হেসে কুটিপাটি। বলল, 'দাঁড়াবো কেন, তোমার কিসের ভয় ?'

বড় মামা ধমক দিয়ে বললেন, 'ফ্যাচ ফ্যাচ করিস না। দাঁড়াতে বলছি দাঁড়াবি।'

ছেলেটা অবশ্য দাঁড়াল। বড়মামা বাথরুমে কাজ সেরে এলে ছেলেটা বলল, 'কিসের ভয় বললে না ?

বড়মামা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ভূতের।'

ছেলেটা হাসতে হাসতে বাতাসে মিলিয়ে গেল। বড় মামা রেগে গিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, 'খুব ফাজিল হয়েছো তোমরা।'

তা এই রকম সব হত দোমোহানীতে। কেউ গা করত না।

কেবল দাদামশাইয়ের বাবা বাতাস শুঁকতেন, লোকের গা শুঁকতেন। একদিন বাজার থেকে ফেরার পথে তাঁর হাতে মাছের ছোট্ট খালুই, তাতে সিঙ্গি মাছ নিয়ে আসছিলেন, তো একটা মাছ মাঝ পথে খালুই বেয়ে উঠে রাস্তায় পড়ে পালাচ্ছে। দাদামশাইয়ের বাবা সেই মাছ ধরতে হিমসিম খাচ্ছেন, ধরলেই কাঁটা দেয় যদি। এমন সময় একটা লোক খুব সহৃদয় ভাবে এসে মাছটাকে ধরে খালুইতে ভরে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। দাদামশাইয়ের বাবা তাকে থামিয়ে গা শুঁকেই বললেন, 'এ তো ভাল কথা নয় ! গন্ধটা খুব সন্দেহজনক ! তুমি কে হে ! অ্যাঁ ! কারা তোমরা ?'

এই বলে দাদামশাইয়ের বাবা তার পথ আটকে দাঁড়ালেন।

লোকটা কিন্তু ঘাবড়াল না। হঠাৎ একটু ঝুঁকে দাদামশাইয়ের বাবার গা শুঁকে সেও বলল, 'এতো ভালো নয়। গন্ধটা বেশ সন্দেহজনক! আপনি কে বলুন তো! অ্যাঁ! কে?'

এই বলে লোকটা হাসতে হাসতে বাতাসে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দাদামশাইয়ের বাবা আর গন্ধের কথা বলতেন না। একটু গম্ভীর থাকতেন ঠিকই, ভূতের অপমানটা তাঁর প্রেস্টিজে খুব লেগেছিল। একটা ভূত তাঁর গা শুঁকে ঐ কথা বলে গেছে, ভাবা যায়?



একটি ভূতের গল্প

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

এমন অসহায় অবস্থার মধ্যে যে পড়তে হবে তা স্টেশনে নেমেও বুঝতে পারি নি। অবশ্য সমুদ্রের পিক সিজন এটা, তা বলে কোনও হোটেল কি কোনও ঘর যে পাওয়া যাবে না, তা বুঝবো কি করে! বড়দিনে তুনিয়ার সব ভ্রমণার্থী প্ল্যান করে এবার যেন পুরীতেই এসেছেন!

আশ্চর্য! ছোট খাট হোটেলগুলির সিঁড়ির তলায় পর্যন্ত দ্বিগুণ কড়ি গুণে কেউ কেউ থাকতে বাধ্য হয়েছেন। স্বর্গদ্বারের ভিতর রাস্তার দোকান ঘরের মতন ঘরগুলিতেও নাকি লোক ঠাসা! বাঙালীর অন্যতম ভরসা ভারত সেবাশ্রমে পর্যন্ত ডজন খানেক পরিবার বারান্দায় মোটঘাট নামিয়ে এতোটুকু আশ্রয়ের আশায় লাইন দিয়ে আছেন।

হন্যে হয়ে খুঁজেও যখন তেমন কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন ধীমানই প্রথমে মুখ খুললো, বুঝলি হীরক, পানের ঐ বুড়ো দোকানীটা পর্যন্ত বলছিল, তার জীবনে পুরীতে এমন ভিড় সে কখনও দেখেনি।

আমি বললাম, তাতো হলো, কিন্তু এখন কি করা?

—বিকেলের মধ্যে একটা বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। দেখাই যাক না। না হলে পাণ্ডাদের বাড়ি তো আছেই। আমার মেশো-

মশায়ের চেনা এক পাণ্ডা। কি যেন নাম—

—ঢের হয়েছে। দু'দিনের জন্যে এসেছি সমুদ্র দেখতে, সকাল বিকেল সী বীচে ঘুরবো ফিরবো, তা না গিয়ে থাকো পাঁচ মাইল দূরে পাণ্ডাদের বাড়ি! আশ্চর্য!

—আহা, চটছিস কেন! ধীমান আমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। কেন না বলতে গেলে ও-ই আমাকে জোর করে এখানে টেনে এনেছে। বললো, একা একা যাবো? চল, দু'জনে দু'দিনের জন্যে ঘুরে আসি। ধীমান নিজেই বুকিং-এর সব ব্যবস্থা করেছে একমাত্র হোটেল বুকিং ছাড়া। বলেছিল, পৌঁছে ঠিক দু'দিনের একটা বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। এমন কি আর!

একটা হোটেলে বসে খেয়ে নিয়ে ঠিক হলো, সঙ্গে লাগেজ বলতে যা আছে তা কোথাও জমা রেখে আপাতত সমুদ্রের পারে গিয়ে বসা যাক।

রাস্তা পার হয়ে এগিয়ে যখন যাবো, তখন হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর পিছন থেকে কানে এলো, কি দাদাবাবু, ঘর খুঁজছেন বুঝি?

তাকিয়ে দেখি নাতিদীর্ঘ মধ্যবয়সী একজন লোক। খালি পা, ছোট ধুতির উপর ঢোলা ফতুয়া, ছোট করে চুল ছাঁটা, গায়ে একটা মলিন চাদর জড়ানো। মুখাবয়ব দেখে স্থানীয় বাসিন্দা বলেই মনে হয়। তবে বাংলায় দিব্যি কথা বললেও স্থানীয় টান সহজেই ধরা যায়।

লোকটার কথায় হাতে তখন স্বর্গ পাবার মতন। কথা নেই বার্তা নেই গায়ে পড়ে সন্ধান দিতে এসেছে। হয়তো দালালও হতে পারে। ধীমানই এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলো, কেন, ঘরের সন্ধান আছে নাকি? কেমন ঘর? কত ভাড়া?

—আজ্ঞে একখান ঘর আছে। একেবারে সমুদ্দুরের মুখোমুখি। আর ভাড়া? সে আপনারা দেখে শুনে দেবেনখন।

জায়গা না পেয়ে লোক পথে পথে ঘুরছে, আর সমুদ্রের ওপর ঘরের সন্ধান দিয়ে লোকটা ভাড়ার ব্যাপারটা আমাদের ওপরই ছেড়ে দিচ্ছে। কি জানি বড় দাঁও টাও মারতে চায় বুঝি? সেই জন্যেই হয়তো এতো বিনয়!

পরে ঝুট ঝামেলা হতে পারে ভেবে লোকটাকে খোলাখুলিই বললাম, দেখ বাপু, ঘর আমাদের দরকার ঠিকই। তবে স্পষ্ট করে ভাড়ার কথাটা বলো। সিজন টাইম বলে সাধ্যের বাইরে ভাড়া চাইলে আমাদের গিয়ে তো আর লাভ নেই।

লোকটা পান দোক্তা খাওয়া দাঁত বের করে আমার কথার ধার দিয়ে না গিয়ে মাথা চুলকে এক গাল হেসে বলে, দাদাবাবু, ঘরটা কিন্তু আপনারা ঠিক দু'দিনের জন্যে পেতে পারেন। তারপর একটু থেমে ডান হাতটা তুলে আঙুলের কর গুণে বললো, আজ শুক্রবার, কাল হচ্ছে শনি; পরশু রবিবার কলকাতা থেকে বড় বাবুর আসার কথা। আপনারা এই দুটোদিন নিশ্চিন্তি থাকতে পারেন।

লোকটা যখন ডান হাত তুলে দিনের হিসেব করছিল, লক্ষ্য করলাম ওর হাতের ডান কনুই থেকে ফতুয়ারর হাতা পর্যন্ত দগদগে একটা পোড়ার দাগ।

লোকটার কথা শুনে ধীমান একবার আমার মুখের দিকে এবং আমিও একবার তার মুখের দিকে তাকাই। মানে, ব্যাপারটা বোঝা গেছে। অর্থাৎ বাবুর অবর্তমানে কেয়ার টেকার মশাই সুযোগ বুঝে টু পাইস ম্যানেজ করতে চায়!

তা করুক। আমাদের আপাতত বিশ্রামের দরকার। আর তাছাড়া আমাদের এখানকার প্রোগ্রাম তো মাত্র দু'দিনেরই।

ঘরটা দেখে অপছন্দ হবার নয়। মোটামুটি থাকবার মতো সব কিছু আছে। দিব্যি পুরনো আমলের একটা খাট। খান দুয়েক

চেয়ার। একটা লেখাপড়ার টেবিল। বড় মতন একটা বেলজিয়াম কাচের আয়না। অযত্নে অব্যবহারে সব কিছুতেই বয়সের ছাপ।

লোকটা মিথ্যে বলে নি। বাড়িটা একেবারে সমুদ্রের মুখোমুখিই। এবং বলতে গেলে আমাদের ঘরটাও। তবে বাড়িটা অনেকটা একান্তে। সে আমলের খিলান দেওয়া একতলা বাড়ি। বড় বড় জানালা। পাশাপাশি দুটো বড় ঘর। মাঝখানে প্যাসেজ। ভিতর দিকে উঠানের এক পাশে বাথরুম। অন্য ঘরগুলি তালা বন্ধ। বোঝা গেল, বায়ু সেবনের জন্যে কোনও ধনীর একটা তৈরি অট্টালিকা। বছরে একবার বা দু'বার তিনি বা তাঁর আত্মীয়বর্গ একবার ঘুরে যান এখানে।

জিনিসপত্র ভিতরে রেখে সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। বাড়িটার সিঁড়ি থেকেই যেন বালিয়াড়ি শুরু হয়েছে। সমুদ্রের হাওয়ায় বালি উড়ে উড়ে এসে মরুভূমির মতো বন্ধুর পথ রচনা করেছে। সামনে এতোটুকু বাধা নেই, মুখোমুখি সমুদ্র। একের পর এক ঢেউ ভেঙে ভেঙে পড়ছে তীরে। হু হু করছে হাওয়া। সামনেই ডান দিক থেকে শুরু হয়েছে বন দপ্তরের নতুন করে লাগানো ঝাউ বন।

দাঁড়িয়ে সব কিছু লক্ষ্য করছি, এমন সময় পিছন থেকে এসে বিনয়ের হাসি হেসে সামনে দাঁড়াল সেই লোকটি।

বললো, বলিনি দাদাবাবু, একেবারে সমুদ্দুরের মুখোমুখি ঘর?

ধীমান বারান্দার সিঁড়িতে বসে পড়ে জবাব দিল, তাতো হলো। তোমার নামটা কিন্তু জানা হয় নি বাপু।

—আজ্ঞে, রাধানাথ খুন্তিয়া। বিশ বছরের ওপর আমি এই বাড়িটা দেখাশোনা করছি। এখানেই থাকি। তবে নিজের বাড়ি রাস্তার কাছাকাছি একটা গ্রামে। পরিবার ওখানেই থাকে।

—সব বুঝলাম। তবে হোটেলটা একটু দূরে হয়ে গেল। তা, রাধানাথ, সকাল বিকেল চা জল খাবারের কি ব্যবস্থা করা যাবে?

রাধানাথই উপায়টা বাতলে দিল, দাদাবাবু, সকাল বিকেল তো বেড়াতেই যাবেন। বেড়িয়ে টেরিয়ে খেয়ে দেয়ে দু'বেলা একেবারে ঢুকবেন। আর চায়ের ব্যাপার? ওর জন্যে ভাবতে হবে না। এই বাড়িরটার পিছনের গলিতে দশরথের দোকান আছে। যখনই চায়ের দরকার হবে বলবেন, আমিই আপনাদের জন্যে এনে দেবো। দশরথের দোকানে তেলেভাজা, জিলিপিও পাওয়া যায়।

আমি বললাম, তাহলে আর ভাবনা কি।

রাধানাথকে এক দফা চায়ের অর্ডার দেওয়া হলো। সে চলে যেতেই ধীমান বললো, বুঝলি হীরক, মনে হয় লোকটা ভালই। দু'পাঁচ টাকা বকশিস দিলেই হবে।

বললাম, বুঝলি লোকটাকে যতই দেখছি ততোই যেন কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, সব সময় চাদরে গলাটা ঢেকে চাদরটা ডান হাতের উপর ফেলে রাখে কেন?

—ও কিছু না। শীতকাল তো। তা ছাড়া গ্রামের মানুষ। হয়তো পুরনো অভ্যেস।

—না রে, ও যখন আমাদের ঘরের কথাটা বলছিল তখন তুই দেখেছিস কিনা জানি না, ওর ডান হাতের কনুই থেকে একটা পোড়া ঘায়ের মতন দগদগে দাগ নজরে এসেছিল। হয়তো পোড়া দাগটা ঢেকে রাখতে চায়, কিংবা ওটা অন্য কিছু—

—তাতে আমাদের কি।

—না, আসলে এতো লোক থাকতে আমাদেরকেই বা ঘরের সন্ধান দিতে এলো কেন, সেইটেই বেশি খটকা লাগছে।

রাধানাথ এসে পড়াতে আমাদের আলোচনায় ছেদ পড়লো।

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ধীমান বললো, কেমন আশ্চর্য নীরব পরিবেশ। ঝাউ বনের শন্ শন্ আওয়াজ আর সমুদ্রের অনন্ত গর্জন। এ পাশে শুধু আমরা তিন জন।

রাধানাথকে জিজ্ঞাসা করলাম, এতো বড় বাড়িতে একা যে থাকো ভয় করে না ?

—ভয় কেন দাদাবাবু। ভয় করবে কেন। একা চুপচাপ ভালই তো লাগে।

কথাটা ঘুরিয়ে নিতে চেষ্টা করি, না মানে দিনকাল তো ভালো নয়। রাত বিরেতে চোর ছ্যাঁচোর—

রাধানাথ বাঁ হাত দিয়ে চাদরটা একটু একটু ডান পাশে ঝুলিয়ে দিতে দিতে বলে, আজ্ঞে, এখানে ওসব ঝামেলা নেই তবে মাঝে মধ্যে রাতের দিকে দু'একটা উটকো কুকুর শ্মশান থেকে এসে পড়ে ঝামেলা বাধায়। বারান্দাটার এই দিকটা তো দেখছেন একেবারে খোলা —

রাধানাথ চায়ের গেলাস দু'টো নিয়ে চলে যায়।

সন্ধ্যেয় ঘুরে ফিরে হোটেলে খেয়ে রাতে ঘরে ফিরলাম দু'বন্ধু। দরজার কড়া নাড়তেই কিছুক্ষণের মধ্যে খুলে দিল রাধানাথ।

দরজা খুলতেই কেমন যেন একটা গা গোলানো গন্ধ নাকে এলো। কি জানি, রাধানাথ হয়তো ভিতরে শুঁটকি মাছ রান্না করছিল। যাক গে। পিছনে পিছনে রাধানাথ এসে আমাদের ঘরে ঢুকলো। নিজেই সুইচ টিপে আলো জ্বালালো। তখনও সেই রকম চাদর গায়ে তার।

বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিয়ে রাধানাথকে বসতে বললাম একটা চেয়ারে। ধীমান ততক্ষণে বড় জানালাটা খুলে দিয়ে সমুদ্র দেখছে। জানালা খুলতেই ঘর জুড়ে হাওয়ার মাতামাতি। দেয়ালে ছেঁড়া ক্যালেণ্ডারে ছৌ নাচের মুখোশের ছবি পেণ্ডুলামের মতো একবার এ পাশ একবার ও পাশ করছে !

রাধানাথকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি গো, রান্না করছিলে বুঝি ?

—আজ্ঞে, খাওয়া দাওয়া কমপিলিট! আপনাদের আসবার অপেক্ষাতেই ছিলাম।

টুকরো টুকরো কথা হচ্ছিল রাধানাথের সঙ্গে। ইতিমধ্যে পাওয়ার কাট। ঘড়িতে প্রায় রাত সাড়ে বারোটা।

রাধানাথ উস্‌খুস করছে। হয়তো ঘুম পেয়েছে। ম্লান জ্যোৎস্নায় বারান্দার জাফরির ছায়া দুলে দুলে উঠছে দেয়ালে।

শেষ পর্যন্ত কথাটা বলে ফেললাম। আচ্ছা রাধানাথ, তুমি হঠাৎ আমাদেরই ঘরের সন্ধান দিতে গেলে কেন? অনেকেই তো ঘর খোঁজাখুজি করছিলেন।

রাধানাথ ইতস্তত করে জবাব দিলো, না, আপনাদের দেখছিলাম ক্লান্ত হয়ে ঘর খোঁজাখুজি করছিলেন।

— তাহলে দেখছি আমাদেরই লক্ষ্য করছিলে! কিন্তু কেন?

রাধানাথ চুপ করে থাকে। আমার কথার জের টানে ধীমান, ব্যাপারটি কী বলো তো?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাধানাথ। তারপর রহস্যের জট খোলে।

আসলে ধীমানকে পথে দেখে রাধানাথ চমকে গিয়েছিল। তার ছোট ভাই বলরাম নাকি অবিকল ধীমানের মতো দেখতে। ছোট ভাই ছিল তার প্রাণাধিক। গাঁয়ের বাড়িতে থেকে চাষবাস করতো। বাপ মরে যাবার পর রাধানাথই ছিল তার সব কিছু। ভাইও দাদাকে ছাড়া আর কাউকে জানতো না। কিন্তু সেবারের ঘূর্ণি ঝড়ে বালেশ্বরে মামা বাড়ি বেড়াতে গিয়ে গাছ চাপা পড়ে তাজা প্রাণটা শেষ হয়ে যায়!

রাতে শুয়ে ধীমানকে বলেছিলাম, ভাগ্যিস তুই অনেকটা বলরামের মতো দেখতে। না হলে এই আস্তানাটাও হয়তো জুটতো না!

ধীমান ততোক্ষণে নাক ডাকতে শুরু করেছে।

অনেকক্ষণ বকবকানিতে আমার দু চোখের পাতা সহজে এক

হতে চাইল না। অদূর থেকে ভেসে আসছে সমুদ্রের উত্তাল গর্জন, হু হু হাওয়ার দাপাদাপি। মাঝ রাতে কাঠের জানলা দরজাগুলি যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে! কোত্থেকে ছুটো চামচিকে ঘরে ঢুকে হঠাৎ চড়কি বাজি খেতে থাকে। ভিতর দরজার বাইরে কিসের যেন খস্‌খস্‌ আওয়াজ। পুরনো বাড়ি, হয়তো ছুঁচোটুঁচো হবে। কিন্তু হাওয়ায় কেমন যেন গা গোলানো শুঁটকি মাছের গন্ধ! অন্ধকারে ছু'চোখ মেলে তাকাই। চামচিকে ছু'টো বোধহয় গোত্তা খেয়ে মাটিতে পড়ে গেছে। থাক গে। পাশ ফিরে শুই।

হঠাৎ তারস্বরে ছু'টো কুকুরের ডাক। যেন বাইরের বারান্দায় এসে মুখ খুলেছে। নির্জনতা টুকরো টুকরো হয়ে পড়ছে ওদের বিকট কান্নার সুরে। হঠাৎ ডাকটা থেমে যায়। কিন্তু মনে হয় ভিতর দরজার ওপাশে কুকুর ছু'টো দাপাদাপি করছে! একটার বোধহয় গলায় কিছু আটকেছে, খ্যাঁক খ্যাঁক করছে! সর্বনাশ, সদর দরজা খোলা ছিল নাকি?

কিছুক্ষণ পরে সব দাপাদাপি যেন থেমে যায়। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে চেষ্টা করি। কিন্তু হঠাৎ মনে হয় কেউ যেন মাঝ রাতে ছাদে পায়চারি করছে। ঘুম আসছে না রাধানাথের হয়তো, খেয়াল চেপেছে পায়চারি করার। কিন্তু তাই বলে শেষ ডিসেম্বরের এই মাঝ রাত্তিরে!

ঘুমটা এসেও যেন থমকে যায়। রাত্রির সঙ্গে তাল দিয়ে সমুদ্র আরও মাতাল হয়ে উঠেছে। অবিরাম ঢেউ ভাঙার শব্দ হু হু করে বয়ে আনছে বাতাস। জানালা দরজার কাঁপুনি ক্রমেই বাড়ছে! হাওয়ার তীব্রতায় হঠাৎ বড় জানালাটার কপাট ছুটি ঘটাং করে খুলে যেতেই কাচ ভাঙার শব্দে ঘরের ভিতরটা যেন কেঁপে ওঠে। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে চেঁচিয়ে ওঠে ধীমান, কে-কে?

বললাম, হাওয়ার দাপটে হয়তো ছিটকিনি আলগা হয়ে যেতেই

জানালা খুলে গেছে। আর হাওয়ার ঝটকায় টেবিলে রাখা কাচের গেলাসটা ছিটকে পড়ে খান খান।

—না, জানলার পাশ দিয়ে কে যেন সরে গেল। গায়ে কি একটা জড়ানো!

--ধুৎ, ঘুম চোখে জানালার পাল্লাটাকে নড়তে দেখেছিস কিনা!

উঠে আলো জ্বালাতে গেলাম। এখনও লোড শেডিং। একবার জানালার ধারে গিয়ে উঁকি মারলাম। কিছু নেই। শুধু নৈঃশব্দ্য ছিন্ন ভিন্ন করছে সমুদ্রের গর্জন। ততক্ষণে ধীমানও এসে পাশে জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়েছে। দূরে অন্ধকার যেন ফুলে উঠে ভেঙে পড়ছে—সাদা ফেনা ছড়িয়ে পড়ছে বেলাভূমিতে। ডান পাশের ঝাউ বন পাগলের মতো মাথা নাড়ছে।

ধীমানের একহারা চেহারা হলে হবে কি, ওর কিন্তু দারুণ সাহস। কলকাতার সেই দুঃস্বপ্নের রাতেও ও কিন্তু দিব্যি সিঁথি থেকে শ্যামবাজারে হেঁটে এসে মায়ের জন্য ওষুধ কিনে নিয়ে ফিরেছে।

হঠাৎ দু'জনেরই নজর পড়লো। ঝাউ বনের ভেতর থেকে কে যেন বেরিয়ে এলো। অন্ধকারে গায়ের জড়ানো চাদরের এক প্রান্ত পত পত করে উড়ছে। লোকটা ঝাউ বন থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ বালিয়াড়িতেই পায়চারি করলো। একসময় অনেকটা নেমে গিয়ে যেখানটায় ঢেউ ভাঙছে সেখানে জলে পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

ধীমান বললো, কি ব্যাপার বলতো? জেলে টেলে নাকি? ওরা তো শেষ রাতে মাছ ধরতে নামে। কিন্তু একা কেন!

হঠাৎ লোকটা যেন উধাও হয়ে যায় এবং পর মুহূর্তেই কোত্থেকে ঝাউ বনের ধারে এসে দাঁড়ায়। কি জানি পাগল টাগল কেউ হবে।

কিন্তু লোকটা যে নিমেষেই লম্বা হয়ে গেল। ঝাউ বনের মাথা ছাড়িয়ে গেছে! বাজপড়া একটা তাল গাছের মতন। এখনও হাওয়ায় চাদর উড়ছে।

গলা শুকিয়ে এলো। হাওয়ায় দারুণ গা গোলানো পোড়া

গন্ধ ভেসে আসছে। আমি জোরে ধীমানের একটা হাত ধরলাম। ট্যাঙা লোকটা হঠাৎ তার বাঁ হাতটা উঁচু করে ধরলো। তারপর নামিয়ে ঝাউ গাছগুলির মাথায় হাত বোলাতে লাগলো যেমন করে কেউ পোষা জীবজন্তুকে আদর করে। অনেকক্ষণ এমনি করার পর লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে আমাদের বাড়িটার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে থমকে দাঁড়াল। নিমেষের মধ্যেই দেখি স্বাভাবিক মাপের একটা মানুষ কিছুটা উৎরাই ভেঙে বাঁ দিকে সোজা হেঁটে চলে গেল। ধীমান বললো, জানলাটা বন্ধ করে দে। হওয়ায় পাগল হয়ে যাবার উপক্রম!

দিনের আলোয় মুখোমুখি হতেই ধীমানকে বললাম, ব্যাপারটা কি হলো?

—কী জানি, ঘুম চোখের ব্যাপার। কথাটা থেমে যায় রাধানাথ চা নিয়ে আসতেই। লক্ষ্য করলাম, রাধানাথ তাকিয়ে আছে ধীমানের দিকেই।

আমার চোখ পড়তেই রাধানাথ চোখ সরিয়ে নিয়ে ঘাড় আরো নিচু করে বিনয়ের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ হাত কচলাতে কচলাতে বললো, দাদাবাবু, আমাকে আজ একটু দেশের বাড়িতে যেতে হবে। জমিজমা নিয়ে গণ্ডগোল। চায়ের দোকানে গাঁয়ের একটা লোক কাজ করে। ও কাল দেশ থেকে এসেছে। ও-ই খবর দিল।

একটু থেমে আবার বলে, বিকেলের চা জল খাবার দোকানের ভীম বলে একজন এসে পাঁচটা নাগাদ আপনাদের দিয়ে যাবে। আমি সকালের বাসে গিয়ে রাতে ঠিক ফিরে আসবো। না হলে কাল খুব সকালে।

সকালে ঘুরে ফিরে সমুদ্রে স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে ঘরে ফিরছি। বারান্দায় দেখি দু'তিন জন মানুষ। সঙ্গে ছোট মতন একটা বেডিং, সুটকেশ। একজন বয়স্ক ভদ্রলোক সারা মাথায়

সাদা চুল, বেডিং-এর উপর বসে। মনে হলো খুব ক্লান্ত। সঙ্গে বেয়ারা গোছের একজন। আর এক জনকে একেবারে এখানকার বলে মনে হলো। কপালে বড় করে সিঁদুরের ফোঁটা।

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। আমরা বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই বুড়ো ভদ্রলোক বলে উঠলেন, আপনারা ?

কি জবাব দেবো ভেবে না পেয়ে আমিও বললাম, আপনারা ? সঙ্গে সঙ্গেই আবার বললাম, আমরা, মানে আমরা এখানে কাল থেকে আছি। এবং কালই আবার কলকাতায় চলে যাবো।

—আছেন মানে ? এ বাড়িতো আমার। আর তাছাড়া বাড়ির চাবি তো আমার কাছে। ঢুকলেন কি করে ?

ভদ্রলোকের কথায় কেমন যেন খটকা লাগে। কি সব বলছেন উনি !

ভদ্রলোক বললেন, তাঁর নাম ধর্মনারায়ণ রায়। থাকেন দমদমের অশ্বিনীনগর। আগামী কালই তাঁর আসবার কথা ছিল, কিন্তু এখানকার বাড়িটার বন্দোবস্ত করতে সময় লাগবে বলে তিনি একদিন আগেই এসে পড়েছেন। গাড়ি দু'ঘণ্টা লেট, তাই একটু বেশি বেলাতেই পৌঁছেছেন।

ভদ্রলোক বললেন, দেখে তো মনে হচ্ছে পড়শোনা শেষ করে আপনারা চাকরি বাকরি করছেন। তাই বলে ফাঁকা বাড়ি পেয়ে—

—আজ্ঞে না। এখানে আশ্রয় পাবার নেপথ্যকাহিনী ধীমানই খুলে বললো ধর্মনারায়ণ বাবুকে। সব শুনে ধর্মনারায়ণবাবুর মুখ কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সেই সঙ্গে সঙ্গী দু'জনেরও।

ধর্মনারায়ণবাবু আমাদের দিকে অসহায়ের মতন তাকিয়ে বলে উঠলেন, বলছেনটা কি ? রাধানাথ কি করে হবে ? আমার বাড়ির বিশ বছরের কেয়ার টেকার রাধানাথ তো দিন দশেক হলো আগুনে পুড়ে মারা গেছে। সে দেশের বাড়িতে মাসের টাকা দিতে গিয়েছিল। হঠাৎ গোয়াল ঘরে খড়ের গাদায় আগুন

লেগেছিল। নেভাতে গিয়ে তাকে পুড়ে মরতে হয়। কয়েকদিন সে হাসপাতালে বেঁচে ছিল বটে, তবে পিঠ বুক আর ডান হাতের কনুই পর্যন্ত পুড়ে বীভৎস হয়ে গিয়েছিল।

ধর্মনারায়ণবাবু একটু থেমে আবার বললেন, বাপ মারা যাবার পর তার ছেলে আমাদেরই খুব জানাশোনা এখানকার এক পাণ্ডাজীকে বাড়ির চাবি বুঝিয়ে দিয়ে যান। উনি কয়েকদিন আগে কলকাতায় গিয়েছিলেন। আমরা একসঙ্গে আজ ফিরছি।

ধর্মনারায়ণবাবু সিঁদুরের টিপ পরা সঙ্গের মানুষটাকে দেখিয়ে বললেন, উনিই সেই পাণ্ডাজী। ওঁকে জিজ্ঞাসা করেই দেখুন।

পাণ্ডাজী মাথা নেড়ে ধর্মনারায়ণবাবুর কথায় সায় দিলেন।

কারো মুখেই অনেকক্ষণ কথা সরলো না।

কিছুক্ষণ বাদ ধর্মনারায়ণবাবুই বললেন, রাধানাথ মানুষটা কিন্তু খুব ভালো ছিল! কিন্তু দুঃখের কথা কি জানেন। ঝড়ে গাছ চাপা পড়ে ওর আদরের ভাইটা মারা যেতেই ও যেন কেমন হয়ে গেল। সময় পেলেই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতো। ভাইকে খুঁজে বেড়াতো। ভাই ভাই করে পাগল হয়ে গিয়েছিল।

এই ভর দুপুরে আমার গায়ে যেন শিহরণ খেলে গেল। বুকের স্পন্দন বাড়তে থাকে। হঠাৎ দমকা হাওয়ায় রোদের হলকা যেন গায়ে এসে লাগে।

ধীমান বললো, কিন্তু রাধানাথ যে আজ সকালেই বিশেষ দরকার বলে ভোরে দেশে চলে গেল। বলে গেল, রাতের বাসে ফিরতে পারে।

পাণ্ডাজী অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন বিড় বিড় করছিলেন। ধর্মনারায়ণবাবু ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, পাণ্ডাজী কিছু বলুন।

—হিসেব মতো আজ রাধার শ্রাদ্ধ। সুতরাং সে আসবে কি করে?

ধীমান এবারে ধুপ করে মাটিতেই বসে পড়ল। আজ সকালেও তাহলে চা খাওয়ালো কোন্ রাধানাথ?